মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

বিধবা গঞ্জনা

(নারী নির্যাতনের ইতিহাস)

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

হিন্দু-মুসলিম সমাজ সংস্কারক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের়ুল্লাহ প্রণীত

বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার

[বইটির প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে জানা যায় না, তবে ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে
এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে]

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের়ুল্লাহ্ রিসার্চ একাডেমী
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও সংযোজিত
প্রধান সম্পাদক ঃ মুন্‌শী এম. এ. মজীদ

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের়ুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী
(স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন এবং গবেষণাধর্মী একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মু. মো. মেঃ রি. একাডেমী প্রকাশনা-৩

প্রকাশনায়

মোহাম্মদ শামসুজজামান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক
মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Estd. in the year : March-1997

উপদেষ্টা
জনাব এডভোকেট মুনিরুজজামান
জনাব প্রফেসর ড. এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান
জনাব ড. আ. ন. ম. রশিদ আহ্মাদ
জনাব অধ্যাপক মিনহাজুর রহমান
জনাব অধ্যাপক আতিকুর রহমান ভূঁইয়া
জনাব এডভোকেট লোকমান হোসেন
জনাব উবায়দুর রহমান খান নদভী
জনাব শহরুল হোদা সরকার (সবুজ)
জনাব হাজী সাহাবউদ্দিন আহমদ

একাডেমীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশ
১ম প্রকাশ-১৯৯৮ ইং
২য় প্রকাশ-১৯৯৯ ইং
৩য় প্রকাশ-২০০০ ইং
৪র্থ প্রকাশ-২০০১ ইং
৫ম প্রকাশ-২০০২ ইং
৬ষ্ঠ প্রকাশ-২০০৩ ইং
৭ম প্রকাশ-২০০৬ ইং

বর্ণ বিন্যাস
জবা কম্পিউটার
বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)
৪৫, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
আল-আকাবা আর্ট প্রেস
৩৬, শিরিশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-624-002-4

[নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন এক হৃদয়বান ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় বইটি প্রকাশিত]

সূচীপত্র

আমাদের কথা

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী বৃটিশ শাসনামলে যশোরের একটি অখ্যাত গ্রামে ১৮৬১ সনের ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের মাত্র চার বছর আগে ১৮৫৭ সনে বিধ্বস্ত হয়েছে বৃটিশ বিরোধী সর্বশেষ সশস্ত্র অভ্যুত্থান 'সিপাহী বিপ্লব'। এ বিপ্লবে মুসলমানদেরই ভূমিকা ছিল মুখ্য। তাই বিপ্লব ব্যর্থতার পর এক নতুন উদ্যমে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে শুরু হয়েছিল বৃটিশ শাসকদের মুসলিম বিরোধী অভিযান। তাতে সক্রিয় ইন্ধন যোগাচ্ছিল প্রতিবেশী সমাজের নেতৃবর্গের বিপুল অংশ। এ দ্বিমুখী সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে খ্রীস্টান ইংরেজ শক্তির সাথে সমঝোতায় না পৌঁছে মুসলমানদের টিকে থাকা সেদিন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে উপমহাদেশের খ্যাতনামা মুসলিম নেতাদের অনেকেই সেদিন চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন বৃটিশ সরকারের সাথে সমঝোতা ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার কথা।

উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের সে ঘোর দুর্দিনে বাংলার অখ্যাত পল্লীর এক সামান্য দর্জি মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ গর্জে উঠেছিলেন। বৃটিশ শাসকদের ছত্র-ছায়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ররত খ্রীস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিতে এগিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, প্রকৃত মুসলমান এক আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ার কোন শক্তিকে ভয় করে না। বৃটিশ রাজশক্তির নিকট মাথা নত না করে বাংলার হাটে-মাঠে, পথে-প্রান্তরে সেদিন তিনি প্রচার করেছিলেন ইসলামের শাশ্বত বিপ্লবের বাণী; উজ্জীবিত করেছিলেন ধ্বংসের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া নির্যাতিত, নির্জীব মুসলিম সমাজকে। গদ্যে-পদ্যে অসংখ্য বই লিখে, গ্রাম বাংলার গ্রামেগঞ্জে অসংখ্য জনসমাবেশে দৃপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন নবজীবনের আশার বাণী। বিশ শতকে বাংলা তথা উপমহাদেশ যে যুগান্তকারী ইসলামী রেনেসাঁ প্রত্যক্ষ করেছিল, তাঁর পিতৃপুরুষ ছিলেন মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ-এ কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে।

ইসলামী রেনেসাঁর এ মহান সমাজ সংস্কারক সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম বলতে গেলে কিছুই জানে না। জাতীয় জীবনের এই দুরপনেয় লজ্জা দূর করার জন্যে বহু বিলম্বে হলেও এ কীর্তিময় দ্বীন সেবকদের নামে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী নামে একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গত ১৯৯৭ সনের মার্চ মাসে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের জাতীয় জীবনে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিচার্স একাডেমীর তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে আলোচ্য বইটি প্রকাশ করেছি। এই ব্যাপারে বলতে গেলে এক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পারব জানি না, তবে আমাদের ইচ্ছা এ ভুলে যাওয়া অতীত ইতিহাসের আলোচিত ব্যক্তিত্ব ও হিন্দু-মুসলিম সমাজ সংস্কারক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (রহঃ)-এর সব লেখাই ক্ষুদ্র অথবা রচনাবলী আকারে বের করে বর্তমান প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছা রাখি, আমাদের সচেতন মহল যদি এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব।

—মোহাম্মদ শামসুজজামান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক

ঢাকা

উপক্রমণিকা

বহুকাল পূর্বে এই কথার স্থির মীমাংসা হইয়া গিয়াছে যে, এই সুবিশাল পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু এবং বিষয় নাই, যাহার ভাবাভাব লাভালাভ সমুদয় মানবমণ্ডলী সমভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন।

জগতে যে কালে যে কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, যে কোনও মহদানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন, সেই কালেই মানবমণ্ডলী দুই দলে বিভক্ত হইয়া, একদল তাঁহার সপক্ষ, অপর দল তাঁহার বিপক্ষ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ ও ঝগড়া-বিবাদ করিয়াছেন।

যে বিধবা হৃদয়ের জ্বলন্ত ছবি অঙ্কন ও প্রদর্শন করিয়া একদিন যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় বহু গুণসম্পন্ন, বহু বিদ্যায় বিভূষিত ভারত সুহৃদ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিতকুল চূড়ামণি দয়ার সাগর, ভারত-রত্ন, অবলা বান্ধব, বিধবা জীবন, অনাথ বন্ধু, চিরস্মরণীয় পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপক্ষ দল কর্তৃক কত শত প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপভাষায় তিরস্কৃত হইযাছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; সেই অসীম যাতনাগ্রস্ত ও অনন্ত বিষাদপূর্ণ অবলা হৃদয়ের বিষাদ সঙ্গীত বর্ণনা করিতে যাইয়া, সাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীন অভাজন জনকেও যে অনেকের চক্ষের বালি এবং বহুবিধ অভিনব বিশেষণে বিশেষিত হইতে হইবে, তাহাও নিঃসন্দেহ। এই পুস্তকে শব্দ যোজনার কোন বৈচিত্র, বর্ণবিন্যাস এবং রচনা মাধুর্যের কোন বাহাদুরী নাই এবং ইহা কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বনেও রচিত নহে।

কিন্তু যাঁহারা সরলচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিধবাচিত্তের তত্ত্ব অবগত হইবেন, এই গ্রন্থে লিখিত উক্তিগুলি অক্ষরে অক্ষরে পত্রে-পত্রে, ছত্রে-ছত্রে সত্য বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রমাণিত ও গৃহীত হইবে।

সুযোগমত বিবিধ শ্রেণীর যুবতী বিধবাগণের স্বহস্ত লিখিত দুঃসহ জ্বালা, শোকসূচক যে সকল পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে তাহার কিয়ংদংশ বর্ণনা করিয়া আমরা বঙ্গবাসী পাঠকবর্গকে উপহার দিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এই গ্রন্থের স্থান বিশেষের ফুট নোটেও তাহা দেখিতে পাইবেন।

কেবল হিন্দু ঘরেই যে বিধবাদিগের প্রতি নিগ্রহ এমন নহে। এই বিশাল বঙ্গের নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলাসমূহের স্থান বিশেষে হিন্দুগত প্রাণ, মুসলমান নামধারী বহুতর মিয়া সাহেবদিগের ঘরে এখনও অসংখ্য তরুণ বয়স্কা বিধবা রমণী অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধীভূতা হইতেছেন। বিধবা বিবাহ না

হওয়াতে উক্ত স্থানসমূহে কত ব্যভিচার, গর্ভপাত, নরহত্যা এবং পবিত্র মুসলমান নামে কলঙ্ক-কালিমা প্রলেপিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে?

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, কলিকাতার বর্তমান মুসলমান কুলকলঙ্কিণী বারাঙ্গণাগণের মধ্যে গোয়াড়ী (নদীয়া) জেলার মুসলমান গৃহের বিধবাই অধিক।

যাহা হউক, যদি এখনও সর্বসমাজের ধুরন্ধরগণ সেই অসহায়া, অবলা বিধবাদিগের বিষয় কিঞ্চিৎ চিন্তা ও বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ ধ্বংসগত বংশ রক্ষা পাইত এবং অসংখ্য আশরাফুল মাখলুকাত দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইত।

আমি ভাষাবিদ পণ্ডিত নহি; নিজ মনের সামান্য ভাব মাতৃভাষায় ব্যক্ত করিতেই শতবার ঘুরপ্যাঁচ খাইতে হয়, তখন অন্যের মনের (বিশেষতঃ জর্জরীভূতা বিধবা হৃদয়ের সেই দুরূহ কথা) ভাব প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য হওয়ার আশা করাও ছেলেমিপনার পরিচয় দেওয়া মাত্র। কিন্তু আমি কোন্ বলে ও কোন্ সাহসে ঈদৃশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম?

দেখিয়াছি, বাচ্চারা যখন কোন মনোভাব ব্যক্তকরণ মানসে অস্ফুট ও অসম্পূর্ণভাবে দুই একটি অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা তৎক্ষণাত তাহার সমস্ত মনোভাব বুঝিয়া লন; আমার সম্বলও সেই অসম্পূর্ণ ভাষা মাত্রেরই নামান্তর।

আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষাদোক্তিসমূহ যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা সরল, সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। এমন কি, স্থান বিশেষে সাধারণ "মেয়েলী" ভাষা ব্যবহার করিতেও লজ্জাবোধ করি নাই। অতএব, আমার লিখিত ভাষায় যে বহুতর ত্রুটি ও দোষ দৃষ্ট হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যদি ইহা দ্বারা একজন বিধবা বিবাহ বিদ্বেষীরও সেই প্রস্তরবত নীরস চিত্ত ক্ষণকাল দোলায়মান ও চঞ্চলিত হয়, তাহা হইলেও আমার শ্রম বহুলাংশে সফল হইবে, সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ও প্রবীণ লেখকদিগের গ্রন্থে যখন ভুরি ভুরি ভুল বাহির হইয়া থাকে, তখন আমি কে?

কিন্তু যে সকল মহাত্মাগণ বিধবা বিবাহের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, পুস্তক দর্শন মাত্রই ভাষার দোষ ধরিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, লেখককে বিবিধ কলঙ্কিত চিত্রে চিত্রিত হইয়া নিত্যই তাহাদিগের গরল মিশ্রিত রসনাগ্রে বিরাজ করিতে হইবে, তাহাও স্থির নিশ্চয়।

যাহা হইক, আমরা সাধক শ্রেষ্ঠ মহাকবি মহাত্মা শেখ সাদীর এই মহোপদেশ অবলম্বনপূর্বক, জ্ঞানতঃ যথাসম্ভব সত্য প্রকাশার্থে ব্রতী হইলাম। যথা—

একদা কোন সংসারবিরাগী তাপস পুরুষ রাজার বিরুদ্ধে সত্য কথা বলিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বলিয়াছেন—

رسانیدن امر حق تاأستن

ززنده نه ترسم كه يك ساست

"রেসানিদানে আম্‌রে হক তাআতাস্ত।

যে যেন্দাঁ না তার্‌ছম কে এক ছাআতাস্ত॥"

অর্থাৎ—

"সত্য উপদেশ দানে উপাসনা হয়।

মুহূর্তেক কারাবাসে নাহি মম ভয়॥"

এই সংবাদ পাইয়া রাজা বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি ঐ হতভাগাকে চির জীবনই কারাবদ্ধ রাখিব, মুহূর্তের জন্যও মুক্তি দিব না। তদুত্তরে ভাষাসত্ত বলিয়া পাঠাইলেন—

كه دنيا بمى ساعتے بشنوست

غم وخرمى پيش درويش نيست

"কে দুনিয়া হামি সাআতে বেশনেস্ত্

গমো খোর্‌রমী পেশে দরবেশ নেস্ত্॥

অর্থাৎ—

"মুহূর্তে ব্যতীত নহে সংসার জীবন।

সুখ-দুঃখবোধ শূন্য তাপসের মন॥"

আমরা তাদৃশ না হইলেও নিন্দুকের অন্যায় নিন্দা, তীব্র তিরস্কার ইন্‌শাআল্লাহ্ সহ্য করিতে পারিব।

—মেহেরুল্লাহ

আভাষ

(গদ্য)

দয়ালু আল্লার নাম করিয়া স্মরণ
সাদরে বন্দিয়া নূর নবীর চরণ।
গাইব সবার কাছে হইয়া বিনীত,
বিধবা-হৃদয়গত বিষাদ-সঙ্গীত।
মোসলেম-জগত-গুরু সাধু শিরোমণি,
প্রত্যেক "হাদীস" যাঁর মরকত-খনি।
দোযখের পথ হতে ফিরাইয়া নরে,
প্রকৃত মুক্তির পথ প্রদর্শন তরে–
ধরাধামে মক্কা-ভূমে জন্মিলেন যিনি,
স্পষ্টই হাদীসে ইহা বলেছেন তিনি।
"প্রকৃত কাঙ্গাল ভবে আছে দুই জন,
নারী মধ্যে এক–যার নাই স্বামী ধন।
স্ত্রীহীন পুরুষ বটে অন্যজন সেই,
এ দুয়ের তুল্য দুঃখী ভবে কেহ নেই।"
পুরুষ স্বাধীন তাই বিবিধ কৌশলে,
ছিঁড়িয়া ফেলায় বটে সে দুঃখ শৃঙ্খলে।
অবলা রমনীকুল চির পরাধীনা,
সেই হেতু বিধবারা থাকে পতিহীনা।
তাও এ ভারতে কতিপয় পাপালয়–
ব্যতীত এ পৃথিবীর কুত্রাপিও নয়।
তাই ত বাসনা আজ, করিয়া যতন–
বিধবা-হৃদয় চিত্র কবির অঙ্কন।
ভারত সন্তানগণে বিনয় করিয়া,
শুনাব বিষাদ-গীতি পরাণ ভরিয়া।
(কিন্তু) বিলাস বাসরে যেই নিজে নিদ্রাগত,
শুনিতে অবলা-দুঃখ হবে কি সম্মত?
সতত হৃদয়ে যার দুঃখ পারাবার;
শুনিবে সে জন কি এ দুঃখ বিধবার।

মধুময় ভাষা যার মুখে অবারিত,
শুনিবে সে জন কি এ কর্কশ সঙ্গীত?
শুদ্ধ ব্যাকরণে যার পূর্ণ অধিকার,
সে কেন শুনিবে এই অশুদ্ধ চীৎকার?
যাক মোর কাজ নাই সে বিচার লয়ে,
গাইয়া শুনাই কিছু বিধবার হয়ে।
'শুনে ও রহস্য, জ্ঞানী উপদেশ পায়,
অজ্ঞানে রহস্য বুঝে জ্ঞানের কথায়।" -(সাদী)
তাই মনে বল বেঁধে লক্ষ্য জীবনের-
সাধিতে বাধিত হয়, অধীন 'মেহের।'

বিধবারাই আনন্দহীনা

আহা! এ সংসার কিবা সুখের আকর।
সুখের তরঙ্গ ইথে খেলে নিরন্তর॥
পলায় তমসা নিশা, ঊষা আগমনে-
সুখে রঙ্গে মাতোয়ারা হয় জীবগণে॥
বহিল প্রভাত বায়ু অতি অনুপম।
সুতানে সঙ্গীত গায় যত বিহঙ্গম॥
পূরবে সুরূপ কিবা অপরূপ রবি।
হাসিয়া ভাসিল, ধরি আরক্তিম ছবি॥
অতীব প্রফুল্ল মনে যত জীবগণ।
দলে দলে ধরাতলে করে বিচরণ॥
কাননে কুসুম কলি বিস্তর ফুটিল।
দলে দলে অলিকুল আসিয়া জুটিল।
বিচারে বসেন রাজা রাজ-সিংহাসনে॥
মহিষী ভূষিতা হন বসন ভূষণে।
রণবাদ্য বাজাইয়া রণবীরগণ॥
সগর্বে করেন সবে সমরে গমন।
সকালে রাখাল দল লয়ে গাভীগণ।
সুতানে গাইয়া করে প্রান্তরে গমন॥
নায়িকা নায়ক সনে সদা ফুল্ল মনে।

করিতেছে রসালাপ সহর্ষ বদনে॥
শিশুকে লইয়া মাতা, বসাইয়া কোলে।
শীতল করিছে প্রাণ, সুমধুর বোলে॥
কল্পে এ ভব-সুখ শক্তি কাহার?
সত্যই এ ভব-ধাম সুখের আগার॥
সুখের কাঙ্গাল কেহ নাই ভব পরে।
কেবলি বিধবাগণ সুখ-শূন্য ঘরে॥
স্বামীই কামিনীদের জীবন সম্বল।
স্বামীহীনা অবলার জনম বিফল॥
সধবার সুখ রঙ্গ সদা নিরখিয়া–
দুখানলে জ্বলে হায়! বিধবার হিয়া॥
বিধবা হৃদয়ে এই নিদারুণ ব্যথা।
শুনাব উপমা ছলে, সে মরম কথা॥
সুধীর গম্ভীর মনে শুনিয়া সুজন।
কর ত্বরা বিধবার দুঃখ বিমোচন॥
"দেলে দর্দমন্দাঁ বরাওয়ার যে বন্দ্ ফারসী।
কে হারগেজ নাবাশদ্ দেলাত দর্দমন্দ্॥" (সাদী)
অর্থাৎ–"ব্যথিত চিত্তের ব্যথা কর নিবারিত।
কদাচ হৃদয় তব হবে না ব্যথিত॥"

বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার

সরলা ও তরঙ্গিণীর কথোপকথন

সরলা ও তরঙ্গিণী যুবতী দুজন।
একদা করিতেছিল কথোপকথন॥
সরলা সধবা ও বিধবা তরঙ্গিণী।
যৌবন সলিলে বসি, খেলে দুরমণী॥
সরলা জিজ্ঞাসে, "দিদি কহ লো আমায়।
এ ভবে নয়নে তোর ভাল কি দেখায়?"
তরঙ্গিণী কহে দিদি তোর মাথা খাই।
আমার চ'খেতে কিছু ভাল আর নাই॥
শৈশব সময়ে পিতা দেন মোর বিয়ে।
শৈশবেই স্বামী ধন যান ফাঁকি দিয়ে।
বিফল জীবন মোর, বৃথা এ সংসার।
মানব জনম হায়! হইল অসার॥
কি আর কহিব দিদি জ্বলিছে হৃদয়।
আত্মীয়-স্বজন মম সকলি নির্দয়॥
নির্মম অধম কুলে জনম আমার।
পতি চন্দ্রানন ভবে হেরিব না আর॥
স্বামী ধনে এ জীবনে হইয়া বঞ্চিত।
কিছুতে না পাই মনে আনন্দ কিঞ্চিত॥
সরলা কহিল, "ওগো তরঙ্গিণী দিদি।
স্বামী ধনে ধনী মোরে করেছেন বিধি॥
আমিও শৈশবকালে পাই পতিধন।
সেই হতে পতি পদে সঁপিনু জীবন॥
যখন বালক স্বামী সাজিয়া সুসাজ।
হেরিত আমায়, আমি পাইতাম লাজ॥
আমিও সাজিয়া তাহা দেখাতেম তায়।
খুশিতে ভুষিত হইতাম দুজনায়॥
অহোরাত্র সাধিতাম যৌবন দেবীরে।
এস গো যৌবন এস এ দেহ মন্দিরে॥
দয়াময় বিধাতার বিধি বাসনায়।

সুখের যৌবন মোরা পাই দুজনায়॥
দুয়ের দেহেতে যেই উদিল যৌবন।
সোনা ও সোহাগাসম হইনু দুজন॥
এ চিত্ত আকাশ পতিরূপ সুধাকরে।
সতত বিদ্যুতসম আলোকিত করে॥
ধরায় হয়েছি মোরা স্বরগ নিবাসী।
প্রণয়-পয়োধি-নীরে মহানন্দে ভাসি॥
পতি পদে সঁপিয়াছি জীবন যৌবন।
পেয়েছি অক্ষয় সুখ হেরে স্বামী ধন॥"
শুনিয়া সরলা মুখে আনন্দ কাহিনী।
ভাসিল বিষাদ সরোবরে তরঙ্গিণী॥
হতাশে ছাড়িয়া এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।
কহিল, সরলা "মোর সকলি বিনাশ॥
তোদের যৌবন বটে সুখের আগার।
হয়েছে ভীষণ কাল, যৌবন আমার॥
অজ্ঞানেই পেয়ে স্বামী অজ্ঞানে হারাই।
জ্ঞানেতে সে চাঁদ মুখ আর হেরি নাই॥
সাজিয়া সুজাজ কেবা দেখাবে কাহায়?
আমি বা সাজিয়া তাহা দেখাব কাহায়?
বালক স্বামীর মুখ হেরিলে নয়নে।
কি আনন্দ হয় তাহা বুঝিব কেমনে॥
গিয়াছে সহস্র খেদে শৈশব জীবন।
এসেছে প্রলয় বেগে বিষম যৌবন॥
তুমি তো খেলার সাথী ছিলে লো সরলা।
কত রঙ্গে এক সঙ্গে করিয়াছি খেলা॥
পতির গৃহেতে আজ তুমি সোহাগিনী।
আঁধার বাসরে একা আমি অভাগিনী॥
সঁপিয়াছ তুমি আজ পতিকে যৌবন।
সঁপিব কাহারে আমি সে অমূল্য ধন?
তুমি আজ প্রেমরসে পতিকে ভাসাও।
আপনি মুচকি হেসে নাথেরে হাসাও॥
প্রেম-নীরে আমি কারে ভাসাইব হায়!
হাসিয়া এ পোড়া মুখে হাসাইব কাহা?
পতির প্রণয়-নীরে সাঁতারিছ তুমি।
জ্বলন্ত অনল কুণ্ডে দহিতেছি আমি॥
সঁপিব কাহার পদে এ নব যৌবন?
সংসার শ্মশান মোর বিনা স্বামী ধন॥"

তরঙ্গিণীর প্রথম বিলাপ

আমি কি করি উপায়,
কি দোষে গো বিধি মোরে দিল হেন দায়?
আসিল মদন জ্বর, শুকাইল কলেবর,
পিপাসায় থর থর, ফাটে গো হৃদয়!
এ নব যৌবন অঙ্গে,
যে তোষিবে নানা রঙ্গে,
বিচ্ছেদ তাহার সঙ্গে, দুঃখে প্রাণ যায়!!
আত্মীয়-স্বজন যারা,
নিজ সুখে আত্মহারা,
দুঃখিনীর প্রতি তারা ফিরেও না চায়!!!

তরঙ্গিণীর এক প্রকার দুঃখভরা হৃদয়ের করুণ কাহিনী শুনিয়া সরলার সুকোমল চিত্ত অতিশয় ব্যথিত হইল, তাই সে সখীকে ডাকিয়া কহিল, "সত্যই লো! আমরা মোটে বচ্ছরে দুই দশ দিন মাত্র নেয়রে (পিতৃ আলয়ে) এসে থাকি; তাই যে কটা দিন তার মুখটা দেখতে না পাই সে কটা দিনই পোড়া পরাণটা যা করে, তা ফুকরে বল্লে সকলেই পাগল বলবে। আহ্! জানি না, তুই এই বয়সে কোন্ পাষাণে বুক ঠেকায়ে বচ্ছরের বারটা মাস কাটিস!

দ্বিতীয় বিলাপ

ফিরে কি শুনালে সরলা,
করিলি কাহিনী ছলে মোরে উতলা॥
তুমি তো নেয়েরে এলে,
সে সাথে স্মরণ হলে,
ডুবিয়ে আশার জলে, জুড়াও হৃদয় জ্বালা!
আমা সম অভাগিনী,
ভবে আর নাহি জানি,
জ্বলন্ত নরকে দহি আমি রে বিধবা বালা!!
আমি এ নব কাহিনী,
জ্বলি দিবা ও যামিনী,
সদা মন উদাসিনী বিনা পতি পদ-মালা!!

তরঙ্গিণীর অনন্ত শোকোচ্ছ্বাস

(চৌপদী)

শুন ওলো দিদি,
মোর দুঃখ যদি,
গাই নিরবধি, প্রাণ মন খুলে।
দিনে হয় নিশি,
অস্ত যায় শশী,
তারাগণ খসি, পড়ে মর্ত কুলে॥
কান্দে রসবতী,
পতিব্রতা সতী,
ভাসাইয়া ছাতি, নয়নের নীরে।
সাগর শুকায়,
পুত্র ত্যাজে মায়,
পত্র নাহি রয় বিটপীর শিরে॥
কাঁদে বায়ু জল
আকাশ মণ্ডল,
কাঁদে তরুদল, বনের ভিতর।
রাজ-সিংহাসন,
ত্যাজেন রাজন,
সাধন ভজন, ত্যাজে সাধুবর॥
কাঁদে সব শাখী,
কাঁদে বন-পাখী,
সবে মুদে আঁখি বনে অবিরল।
রণ-বীরগণ,
তেয়াগিয়া রণ,
কাঁদে আজীবন, হয়ে দুরবল॥
বিধবা হৃদয়,
কি যাতনা সয়,
যদি কেহ তায় দেখিতে পাইত।
তখনি সে জন,
হয়ে অচেতন,
মানব জীবন ত্যাজিয়া যাইত॥
দেবগণ যত,
কাঁদে অবিরত,

হেরিলে সতত বিধবার দুখ।
পাষাণ হৃদয়,
শোকাকুল হয়,
কাঁদিয়া ভাষায় নেত্র নীরে বুক॥
যদি একবার,
কোকিল নিকর,
দুঃখ বিধবার হেরিত নয়নে।
তারা আর তবে,
অত মধু রবে,
গাইত না সবে, স্বপনে শয়নে॥
বিধবার মন,
যেই হুতাশন,
সহে আজীবন, হলে প্রকাশিত।
জীব জানোয়ার,
তবে কেহ আর,
আহার বিহার কভু না করিত॥
মেঘ না গর্জিত,
বারি না বর্ষিত,
আনন্দে হর্ষিত হইত না কেহ।
আর পুনরায়,
শ্মশান চিতায়,
জ্বলিত না হায়! বিধবার দেহ॥
সাগরের মীন,
সেও চিরদিন,
হয়ে উদাসীন, কাঁদিতে সাগরে।
প্রেমের নাগরী,
হায় হায় করি,
যাইত পাসরি, প্রেমের নাগরে॥
শুন লো সরলে,
মদন গরলে,
বিরলে, জর জর প্রাণ।
আর ভব-পরে,
স্বামী-ওঝা তরে,
হেরিব না ঘরে, করিবে কে ত্রাণ॥

তোর স্বামী ধন,
পুলকিত মন,
আইসে যখন বিদেশ হইতে।
আহারে সে কত,
আনে মনোমত,
আভরণ শত তোরে পরাইতে॥
আমি অভাগিনী,
দিবস যামিনী,
বিরহ তাপিনী, হইয়াছি হায়!
পর পতি হেরে,
প্রাণ যাহা করে,
প্রকাশিয়া নরে, বলা নাহি যায়॥
আমি অনাথিনী,
মণিহারা ফণি,
জগত দুঃখিনী, ভবে অকারণ॥
কোন আশা আর,
নাই লো আমার,
ভাঙ্গিয়াছি গা'র, সব আভরণ॥
অই কুলাঙ্গার-
কুলে কেঁদে আর,
হইবে কি সার, হীন কবি কয়।
কলেমা গ্রহণ,
করিলে এখন,
দুঃক বিমোচন হইবে নিশ্চয়।

লঘু ত্রিপদী

জানি না লো দিদি, কোন্ দোষে বিধি,
এই কুলাঙ্গার কুলে।
মোরে পাঠাইয়া, রাখিল গাঁথিয়া,
বিরহ বিশাল শূলে॥
কাহারে সুধাই, আল-অন্ন খাই,
মাখি না মাথায় তেল।
বিনা দোষে হায়! বেড়ী মোর পায়,
আরো এ বিষম এ জেল॥

এ দেহ যখন, করি বিলোকন,
এই খেদ হয় মনে।
হাতে বাজু বালা, গলে স্বর্ণমালা,
পরিব কাহার সনে?
সাদরে বরিয়া, পরাণ ভরিয়া,
মজিব যে রাঙ্গা পায়।
সে চরণ আর, কপালে আমার,
জুটিল না হায় হায়!!
এই করে ধরি কাটিয়া সুপারী,
পান বানাইয়া সুখে।
মধু মিষ্ট হেসে, মাতিয়া সুরসে,
তুলিয়া দিব যে মুখে॥
খয়েরেতে লাল, করিয়া এ গাল,
হাসিয়া রসাল হাস।
উল্লসিত মনে যে ফুল্ল বদনে,
চুম্বিতাম বার মাস॥
এ কোমল কর, প্রফুল্ল অন্তর,
ফিরাব যাঁহার গায়।
মুখে মুখে পান, আদান প্রদান,
করিত যে রসরায়॥
হরষিত মন, করিত চুম্বন,
যেই এ মুখমণ্ডলে।
এই অঙ্গের বেশ, এই হেন সুকেশ,
হেরিত নয়ন খুলে॥
সেই প্রাণনাথ, আমারে অনাথ,
অকালেই করেছে লো।
রমণী জীবন, এই নব যৌবন,
অকারণ হয়েছে লো॥
পরি অলঙ্কার, ঠমক ঝঙ্কার,
কাহারে শুনাব আর।
ভাল শাড়ী পরে, সুবাহার করে,
সামনে দাঁড়াব কার?
হইয়াছি রাঁড়ী, গহনা ও শাড়ী
এই জীবনে পরিব না।

লয়ে স্বামী ধন, প্রেম-আলিঙ্গন,
আর ভবে করিব না।
ফুলেলা মাথায়, আল্‌তা হাতে পায়,
আমি আর দিব না লো।
মুখে মুখ দিয়া পান কেড়ে নিয়া,
কভু আশি খাব না লো॥
পতি ধন বিনে, নিশি মোর দিনে,
নিশিই হল রে সার।
ঘোর অন্ধকার বাসর আমার,
আলো না জ্বলিবে আর॥
হইনু ব্যাকুল. মনোহরা ফুল,
ফুটিল যৌবন বনে।
নাই মধুকর, করিয়া আদর,
তোষিবে কে সে প্রসূনে?
হেন সুকোমল, রসে টলমল,
অবিরল করে তায়।
পেলে যার বাস, জীবনের আশ,
মুনিরাও ত্যাজে হায়!
রোগী ভুলে রোগ, মহাযোগী যোগ—
ভুলে—মহা ঋষিবর।
ভুলে সাধু জন, তেয়াগে সাধন,
উচাটন কলেবর॥
সে বাসে তাবত, মাতে এ জগত,
মাতেরে তাপসগণ।
ভ্রমে দলে দল, ভ্রমর সকল,
হইয়া উদাস মন॥
যে কুচ কমল, হেরিয়া সকল,
দাড়িম্ব লুকায় লাজে।
হায় সে রতন, কে আর যতন,
করিবে জগত মাঝে?
হেরি সে রতন, জুড়ায়ে নয়ন,
যে জন ভুঞ্জিবে রাস।
হায়! কি দুর্গতি, সেই প্রাণপতি,
রয়েছে যমের বাস॥
হায়, হায়, হায়! না জানি এই দায়,
ঘটিল কাহার শাপে।

বিনা বারি দান, এই নব উদ্যান,
শুকাল বিরহ-তাপে॥
আসিল জোয়ার, দেহ-পারাবার
ভাসিল যৌবন বানে।
হায়, মরি মরি, এই হেন সু-তরী,
ডুবিল কাণ্ডারী বিনে॥
হরিষে যে জন, করি আরোহণ,
এই নব তরণী পরে।
মারিবে আঁটিয়া, প্রেমের বটিয়া,
অপরূপ সরোবরে॥
সেই কর্ণধার, প্রেমের আঁধার,
ভবে আর নাই লো।
আমি অভাগিনী, পড়ে একাকিনী,
হাবুডুবু খায় লো॥
মেহেরুল্লা বলে, কেন মনানলে,
জ্বলিছ বিধবাগণ?
কলেমা লইয়া, সধবা হইয়া,
সাধ দু'কালের ধন॥

তৃতীয় বিলাপ

তরণী আমার পড়েছে তরঙ্গে,
হেরে সে তরঙ্গ, অঙ্গ, শিহরে আতঙ্গে।
কাম রূপ প্রভঞ্জনে,
সে তরঙ্গে প্রতিক্ষণে,
বাড়াইয়া শত গুণে, আঘাতে এই অঙ্গে।
সেই মহা তরঙ্গোপরি,
থর থর করে তরী,
হায় কি উপায় করি, কেহ নাই সঙ্গে।
আর কি হেরিব, তায়,
মোরে যেই প্রেম-নায়—
উঠায়ে তরাবে হায়! এই দারুণ ভঙ্গে।

সৌদামিনী

তরঙ্গিণী এইমত বিষাদ সঙ্গীত।
গাইতেছে, হেন কালে তথা আচম্বিত॥
আসিল যুবতী এক, নাম সৌদামিনী।
অতীব লাবণ্যময়ী, ষোড়শী ভামিনী॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু নাসাগ্রে চন্দন।
অক্ষম সেই রূপ কবি, করিতে বর্ণন॥
সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার, যেন মণি-খনি।
চরণে ডায়মণ্ড মল, সুমধুর ধ্বনি॥
পরিধানে সরু শাড়ী, অতি মনোহরা।
কেশ বেশে অনুমান স্বর্গের অপ্সরা॥
গালখানা লাল করা পান খয়েরেতে।
মুক্তা বিনিন্দিত শুভ্র দন্তরাজি তাতে॥
গোলাকার ক্ষীণ মাজা, ছাতিখানা পুরু।
কজ্জল নয়নী তায় জোড়া দুই ভুরু॥
স্তম্ভাকার নিতম্ব যুগল, চারু মতি।
অঙ্গে অংশুমান-আভা গজরাজ গতি॥
পিক বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর মধুময়।
কথা যথা সুধা গাথা সতত বিনয়॥
ধীরে ধীরে কমলিনী তথায় আসিয়া।
শুনিল বিধবা-খেদ ক্ষণেক বসিয়া॥
ছাড়িল খেদের গান যেই তরঙ্গিণী।
স্বীয় শিরে করাঘাত করে সৌদামিনী॥
ছল ছল করিয়া দুচোখে এল জল।
ভাসিল সৌদার তাহে নয়ন যুগল॥
বিষণ্ণ বদনে, ধীরে কহে সৌদামিনী।
সকলের চেয়ে ভবে আমি অভাগিনী॥
নামেতে কেবল আমি হইয়াছি উঢ়া।[১]
সব হতে আমার কপালখানা পোড়া॥

---

১. উঢ়া বিবাহিতা। ২. মেদিনী-পৃথিবী।

মুছিয়া চোখের জল কহে তরঙ্গিণী।
বলিলে এমন কথা কেন সৌদামিনী॥
সারা গায় গহনায় ভরা দেখি তোর।
ঠমক ঝঙ্কারে যার মেদিনী[২] বিভোর॥
স্বর্ণ বর্ণ অঙ্গে তোর পড়িলে নয়ন।
পলকে ভুলিয়া যায় মুণিদের মন॥
পাড়িদার শাড়ীটার দেখিলে বাহার।
তখনি মাটির মন টলে অনিবার॥
চন্দন সিন্দুরে ভরা নাসা ও কপাল।
যাহাতে হয়েছে আলো আকাশ পাতাল॥
কুন্তলে সুগন্ধি তেল নয়নে কাজল।
তবে তোর কি হেতু কপাল পোড়া বল॥
অতীব বিষণ্ন প্রাণে, কহে সৌদামিনী।
শুনিতে চাহিলে যদি শুন তরঙ্গিণী॥
মা বাপের চোখে মোর পড়েছিল ছাই।
টাকার লোভেতে অন্ধ হয়েছিল তাই॥
পাইয়া অনেক টাকা মোর পিতা মাতা।
ভুলিয়া দুজনে তারা আমার মমতা॥
তিন কেলে বুড়ো এক বর না বয়ার[৩]
এনে, দিল তার সাথে বিবাহ আমার॥
যদিও না জ্ঞান মোর হয়েল তখন।
তবু কিন্তু সে বুড়াকে চাহিত না মন॥
বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে উঠিল সজোরে।
প্রলয় তরঙ্গমালা, যৌবন সাগরে॥
কিন্তু হায়! বলিতেও বিদরে[৪] হৃদয়।
দেখে সে বুড়ারে প্রাণ জর জর হয়॥
বিয়ে কালে ছিল, যেইটুকু রস কস।
সেটুকু এখন তার হয়েছে নীরস॥
লো দিদি কব কি? শুধু হয়েছে আমার।
লইয়া শুকনা ঢেঁকি, ঝাঁকি মারা সার॥

৩. বয়ার॥অতিকায় প্রাণী। ৪. বিদরে॥চৌচির।

তাই মনে এই মত করিয়াছি পণ।
বুড়োকে ডাকিব, খুড়ো বলিয়া এখন॥
খুড়ো কিন্তু ধনে মানে বেশ ভাগ্যবান।
তাই তার মনে সদা ধন অভিমান॥
সেই বলে আমা ছাড়া আরো তিন বার।
বিয়ে করে আগেই তা করেছে কাবার॥
সেই তিন পক্ষিয়ের আছে তিন মেয়ে।
দেখিতে সুন্দরী তারা দেবীগণ চেয়ে॥
কামিনী, দামিনী ও যামিনী এই তিন।
তিনেই হয়েছে যৌবনেতে পতিহীন॥
কব কি? যেসব লীলা তারা তিন বোনে।
অহোরাত্র করে সেই খুড়োর সামনে॥
কাঁচা, কচি, বাছা কত দেবতা লইয়া।
লীলা করে কুন্তী, রাধা, দ্রৌপদী হইয়া॥
সে তিন দেবীর ভোগ পূজার কারণ।
খুড়োর বাড়ীতে নিত্য নব আয়োজন॥
দেব দৈত্য কোথা হতে দুষ্প্রাপ্য জিনিষ।
যোগায় তাদের পদে এনে অহর্নিশ॥
চাকর বাকর কত বিনা মাহিনায়।
বান্ধা আছে সে তিন দেবীর দু দু পায়॥[১]

---

১. বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী একজন উচিত বক্তা 'ব্রজবিলাস' নামক পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"দেখুন, বাটীতে বিধবা থাকিলে গৃহস্থের কত শত উপকার হয়। প্রথমতঃ বিনা মাহিনায় রাঁধুনী, চাকরানী, মেথরাণী, পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ বাড়ীর পুরুষদিগের প্রকারান্তরে উপকার হয়; তৃতীয়তঃ বাড়ীর চাকরেরা বিলক্ষণ বশীভূত থাকে, ছাড়াইয়া দিলেও হতভাগা বেটারা নড়িতে চায় না; চতুর্থতঃ প্রতিবেশীরা অসময়ে বাটীতে আসে।:

যে বাটীতেই দুই বা একটি তরুণ বয়স্কা বিধবা আছে, তাহারা এবং তাহাদের প্রতিবেশীরা এই বিষয়ে বিলক্ষণ অবগত আছেন। লেখকের বাটীর অনতিদূরেই হিন্দু পল্লী, তজ্জন্য তিনি হিন্দু বিধবাদিগের জাহের, বাহের, গুপ্ত কাণ্ড প্রচুর পরিমাণে অবগত আছেন। যে কতিপয় অজ্ঞানান্ধ মোসলমান আজিও যুবতী বেওয়াদিগের বিবাহ দেন না, তাহারাও উপরোক্ত রূপ উপকারে বঞ্চিত হন না; তাহাদেরও চাকর বাকর সস্তা।

গদ্য

আঃ! দিদি সকল! আর বলব কি? একদিকে সে বিধবারা নিত্য নূতন নাগর নিয়ে রঙ্গলীলা করে আর এদিকে বুড়ো খুড়ো দামড়া বলদের ন্যায় আমার পাছে নাক শিটকায়ে মরে। এই গয়না, শাড়ী, চন্দন, সিঁদুর না পরলে বুড়ো বয়ার আমায় ছাড়ে না, আমায় সাজায়ে গোজায়ে সামনে বসায়ে, কেবল গায় গা ঘষে নিজের শরীরটা গরম করতে চায়, তাই কি হয়? প্রদীপের তেল ফুরালে তাতে কি আর আগুন জ্বলে?

বুড়ো সং চোখ দুটোয় ঠুসি দিয়ে, শুধু খাশিখুশি ঘাসিঘুসি করেই আমার জ্বলন্ত প্রাণটাকে ঠাণ্ডা করতে চায়; কিন্তু সে সংয়ের ঘুসিঘাসি ও বোক্‌ড়া মুখের হাসি দেখতে আমার এক গুণ আগুন শত গুণ হয়। সাধে কি বলেছি–

"নামেতে কেবল আমি হইয়াছি উঢ়া। (বিবাহিতা)

সবচেয়ে আমার কপালখানা পোড়া।"

সৌদামিনীর শোক-সঙ্গীত

এই পাপ সংসারে আমি বিষাদিনী সেজেছি লো,
এই পোড়া কপাল ফলে দুঃখানলে মজেছি লো!
নব কমলিনী আমি,
অন্ত দন্ত সারা স্বামী,
যৌবন কমল ভারে, উদাসিনী হয়েছি লো।
দুচোখে লাগায়ে ঠুসি,
শুধু বুড়োর কানাঘুষি,
হাসতে গেলে কাশতে লাগে বাপের মাথা খেয়েছি লো।
শুধু সেজে বসে থাকি,
মূলের বেলা স্থূলে ফাঁকি,
নীরস বুড়োর প্রেম-রসে, জলাঞ্জলি দিয়েছি লো।

তরঙ্গিণী কহিল, লো সৌদামিনী! তুই স্বামীকে বুড়ো খুড়ো যাই বলিস তবু তো একটা ধ্বজা আছে; আমার যে একেবারেই বেহাল অবস্থা!

সৌদামিনী। অমিন থাকার মুখে ঝাঁটা। তোরা তা জানবি কিসে? ভরা যৌবনে যারা বুড়ো স্বামীর হাতে ঠেকেছে, তারাই তা দেখেছে। যখন সেই

ঝলমলে গা এই টলমলে গায় ঠেকায়, তখন বোধ হয়, শরীরে শত সহস্র কাকে এসে ঠোকায়! সে না থাকলে আমিও কামিনী, দামিনী, যামিনীর মত কত বাছা নাগর পেতাম, সে থেকেই না এত জ্বালা!

তরঙ্গিণী! তুই কামিনী, দামিনীদের মত হতে সাধ করিস ক্যান, কখনো তাদের জোলাপের ঝাল দেখিসনি? আমিও জানি যে, রাঁড়ীরা[১] বাড়ীর মধ্যে আড়ে অন্তরে গা ঢাকা দে, যা ইচ্ছা তা করতে পারে, কর্তারা পাকে প্রকারে বলেও দেন–

"ঘরে বসে যত পার, গা ঢাকা দে' খাও।

কিন্তু কিরে! ঘরের বাহিরে নাহি যাও।"

তবে বিধির কটাক্ষপাতে রাঁড়ীদের উদরটা যেমন একটু ফেঁপে উঠে, অমনি একটি জোলাপ দিয়া সাফ্ করেন। আহা! সে জোলাপের ঝালে কত রাঁড়ীকে ১০/১৫দিন পড়েই গড়াতে ও কত শতকে শ্মশানে যাইতে হয়, তা দেখিসনি?[২]

সৌদামিনী? তাও সত্যি লো! জোলাপের যে কি ঝাল, তা সতীন-কন্যাদের কল্যাণে প্রায় মাসে মাসেই দেখে থাকি; কিন্তু তবু সে ঝলমলে গায় গা ঠেকাতে

---

১. রাঁড়ীরা-বিধবারা

২. যেমন প্রত্যহ নাড়িতে চাড়িতে মেথরদিগের নিকট বিষ্ঠার দুর্গন্ধ আর মন্দ বলিয়া বোধ থাকে না; সেই রূপ যাহারা ঘরে বিধবা পুষিয়া থাকেন, আছে, তাহাদের গৃহে অনবরত ব্যভিচার, ভ্রূণ-হত্যা বা গর্ভপাত হইলেও তাহাদিগের কাছে সেইগুলি আর তত দূষণীয় বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। হিন্দু সমাজে ভ্রূণ হত্যা ও ব্যভিচার পাপের যত দূর প্রাদুর্ভাব, একজন সুবক্তা হিন্দু সেই বিষয়ে কি বলেন, দেখুন ঃ

"বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ হইবে, এই কথার অর্থ কি? ব্যভিচার যদি বাস্তবিক দোষ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে এই পবিত্র দেশের অতি পবিত্র সাধু সমাজে কদাচ এরূপ প্রবল ভাবে প্রচলিত থাকিত না।

(বিধবা) স্ত্রীলোক অনন্যোপায় হইয়া, অথবা, গুরুজনের খাতিরে বা প্রিয়জনের নাছোড় পীড়াপীড়িতে পড়িয়া, সনাতন ধর্ম ব্যভিচার দেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে গর্ভ সঞ্চার অপরিহার্য; এবং পবিত্র সমাজের অবলম্বিত ও অনুমোদিত প্রথা অনুসারে ভ্রূণ (গর্ভস্থ সন্তান) হত্যাও অপরিহার্য"। ব্রজবিলাস পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠা ও ৪৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

আমাদের মুসলমান সমাজেও যে কতগুলি হিন্দুদিগের অনুকরণকারী কুলাভিমানী জানোয়ার নেকার নাম শুনিলে নাক সিটকায়, তাহাদিগের গৃহেও গর্ভপাত, জেনাকারী এবং হারামীর সংখ্যা কম নহে। বড় বড় কুলাহঙ্কারী মুসলমানদিগের ঘরে যুবতী বেওয়া দ্বারা কত জাহের বাহের অনর্থ ঘটিয়াছে, আমরা তাহার এক তালিকা সংগ্রহ করিতেছি, শীঘ্রই পুস্তকাকারে ছাপাইবার বাসনা আছে।

প্রাণটা চায় না; আবার মনের সেই ধূমায়মান আগুনটাও তো আর সহ্য করা যায় না। দিদি লো! বল দেখি আমি কেমন করে এই টুকটুকে ফুলাঙ্গটা সেই ঠক্‌ঠকে কুলাঙ্গটায় ঠেকাই ও সেই ঠুসি দেওয়া চোখ দুটাকে দেখাই?

তরঙ্গিণী, তা না দ্যাখা না ঠ্যাকা, তবু তোর কপালখানা আমার চেয়ে ভাল; তুই সেই বুড়ো থাকতে যদি আর চারিটা পুরুষেরও জলপান গোগা'স তবু আমাদের দেবী কুন্তী ও দ্রৌপদী হতে কম সতী হবি নে ও আমার মত অফলা রবি নে; বরং ঐ বুড়োকে হেল্লা রেখে যতই যা করবি, তা সেই বুড়োর নামেই তরবি।

সৌদামিনী মুচকি হেসে আমার মনেও এখন ঐ পণ; আর পারি না পারি, খুড়ো থাকতে দু'চারটা গুড়োগাড়ার যোগাড় তো করি।[১]

সরসীবালা

সরলা, তরঙ্গিণী ও সৌদামিনী নাম্নী যুবতীত্রয় এমনিভাবে কথোপকথনে লিপ্ত আছেন, এমন সময় অতুল রূপ লাবণ্যময়ী "সরসীবালা" নাম্নী আর একটি ষোড়শী কোমলাঙ্গিনী সেখানে আসিল, এবং তাহার কতকাংশ শুনিয়া শিরে

---

১. হয়তো এই স্থলে কোন কোন মহাত্মা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত ও বিষ্ঠা বমন করত লেখকের গায় নিক্ষেপের চেষ্টা করিবেন। কেননা কথায় বলে, "হক্ কথায় আহাম্মক বেজার, গরম ভাতে বিড়াল বেজার।" সে যাহা হউক—কি হিন্দু কি মুসলমান, যে শ্রেণীতেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, তাহাদের মধ্যে বহুতর বৃদ্ধ পুরুষের যুবতী ভার্যা বর্তমান। আমরা এই বিষয়ে নিজে অনেক জানিলেও—কিছু না বলিয়া বিগত ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের "নব্য ভারত" পত্রিকায় 'উদ্বাহ বিচার" শীর্ষক যে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা ঃ

"বরিশাল জেলার সাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামের "কর" বংশীয় কোন এক মহাত্মা ৮৪ বৎসর বয়সে এক সরলা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

দ্বিতীয়ত ঃ "ঐ জেলার রায়েরকাটি নিবাসী একজন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ ৬০ বৎসর বয়সে ৯ বৎসর বয়সের একটি বালিকার মাথা খাইয়াছেন।"

তৃতীয়ত ঃ "বর্ধমানের মহারাণীর জনৈক উপগুরু ৬৩ বৎসর বয়সে ১২ বৎসর বয়স্কা একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

চতুর্থতঃ "নারায়ণগঞ্জ সাবডিভিশনের এলাকায় বারিসার নিবাসী চক্রবর্তী বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ ৭০ বৎসর বয়সে, ১৬০০ টাকা পণ দিয়া ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী কয়বা গ্রামের ৭ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকার পাণিপীড়ন করিয়াছেন।"***

করাঘাত করিয়া কহিল, "হা দিদি সকল! আমার মত পোড়া কপালী তোমাদের মধ্যে কেহই নাই।"

সরলা কহিল, "বল দেখি লো সরসী, এখন তোর পালাটা শুনি।"

সরসী, যদি শুনতে চাস, তবে শোন! আমি নাকি কোন্ দেশের কোন্ বিষ্ঠেখোর কুলীন বামনের বৌ! আমার তিন বছর বয়সের সময় নাকি সেই রাঁড়ীচ্ছেলে এসে কুলীন বলে পরিচয় দেওয়াতে, আমার মা বাপ, আত্মীয়-স্বজন পাগল হয়; তাই আমাকে, আর পাড়ার মাসী পিসীতে মিশায়ে প্রায় ৮.৯ টিকে তার গলায় ঝুলায়ে কুল কিনে! শুনেছি সেই কুড়ে নাকি অনেক টাকা পেয়ে আমাদের সকলের নাম বিয়ের খাতায় তুলে নিয়ে যায়; কিন্তু হায়! এই জীবনে আর তার ছায়াটাও দেখলাম না। তাই বলি, তরঙ্গিণী তো রাঁড় হয়েছে। সৌদামিনীর তো বুড়ো হাড়া একটা সামনেই আছে, আমি যে সধবা থেকেও বিধবা। বল দেখি, আমি ও পোড়া মনটাকে আর কি দিয়ে বুঝাই?[১]

"লোকে টাকা পাইলে গরু বিক্রয় করে, কিন্তু হিন্দুরা টাকা পাইলে মানুষ বিক্রয় করিতেও ইতস্ততঃ করে না, ইহারাই রাক্ষস।"

পাঠক! এখন আপনারা বিচার মীমাংসা করুন যে, ৮৪/৬০/৬৩/ ও ৭০ বছুরে খোকারা ৯/১০ বছরের কন্যাকে বিয়ে ক'রে কোন্ যজ্ঞ সমাপন করেন? ঐ সকল ঘৃণিত পিশাচদের উদ্দেশ্য কি?

১. আমরা "সঞ্জীবনী" পত্রিকার কুলীন রহস্য পাঠে বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত আছি যে, বিয়ে ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণেরা অতি শৈশবকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কেবল বিবাহ ব্যবসায় দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন; এমন কি একজন ব্রাহ্মণের ১০৭ ও ১২০টি পর্যন্ত বিবাহের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

কিছুদিন হইল "সুধাকর" পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে, নবগঙ্গার ধারে কোনও এক গ্রামে ৬০ বৎসর বয়স্ক একজন কুলীন খোকা উপস্থিত হন; অমনি গ্রামের কুলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণের দল ক্ষেপিয়া উঠিলেন; কারণ তাহারা কুলীন বর না পাওয়াতে বহু কাল পর্যন্ত কন্যাগণের বিবাহ দিতে পারিয়া ছিলেন না। তাই উক্ত কুলীন খোকাকে পাইয়া তাহারা এক দিনে, একই আসরে নাকি ১৪টি অনূঢ়া কন্যা তাহার গলায় গাঁথিয়া দিলেন। কন্যাদের বড়টির বয়স ৫০ ও সকলের ছোটটির বয়স ৬ বৎসর। যখন বরকে লইয়া ১৪টি হতভাগিনী ঘুরিতে আরম্ভ করিল, তখন চারিদিক হইতে অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ "উলু উলু" রব করিয়া উঠিল; কিন্তু সেই অভাগিনীগণের চক্ষু হইতে অনর্গল ধারায় অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া তাহাদের বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল; কি ভীষণ দৃশ্য! হিন্দুদের কি অপূর্ব সভ্যতা!! বর্বরোচিত সামাজিক নিয়ম কি এইরূপেই রক্ষা করিতে হয়!!!

আর দেখুন! বিগত ১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসে "নব্য-ভারতে" শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয় "উদ্বাহ বিচার" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কুলীন সমাজের কুলাভিমানী

সরলা (সহাস্যে) য়্যালো সরসী! তোর বাপের বাড়ীর চাকর বাকর নেই? বিয়ে ব্যবসায়ী কুলীনের বৌরা যে উপায়ে ছেলেপিলের মা হয়, তা জানিস নে?

সরসী তা আর জান্‌ব না ক্যান্। যার সঙ্গে যা ইচ্ছা, তার সঙ্গে তাই করা যায়, বাড়ীর কর্তারা তা দেখেও দেখেন না, শুনেও শুনেন না, জেনেও জানেন না; বরং পাকে প্রকারে তাঁহাদের ইশারাও তাই! পাড়া পড়শী, চাকর বাকর তো লাগা বান্ধাই আছে; তাদের কল্যাণে উদরটা যখন একটু ফাঁপে, আর অমনি একদিন দুপুর রাত বাড়ীতে হঠাৎ ধুম! কিন্তু সে ফাঁকা ধুম, কেবল এই বাড়ীর পান ও

ব্যক্তিগণের বিবাহ সংখ্যা এবং অবিবাহিতা কন্যাগণের বয়সের পরিমাণ ইত্যাদির সংবাদ বঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলেই অবগত আছেন। পরমারাধ্য স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১২৭৪ সালে হুগলী জেলাস্থ বহু বিবাহকারীগণের এক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ১৩৩ জন কুলীনের নাম পাওয়া যায় এবং তাহাদের বিবাহের মোট সংখ্যা ২,১৯৬টি প্রদত্ত হইয়াছে।** তালিকায় লিখিত বিবাহের উচ্চ সংখ্যা ৮০টি, আর নিম্ন সংখ্যা ৫টি বটে।*** এতভিন্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৩ শে ফাল্গুন তারিখের "স ীবনী'তে যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল এবং বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বহু বিবাহকারীগণের এক তালিকা বাহির হইয়াছিল; তাহাতে মাত্র ৯৬ জন কুলীনের নাম পাওয়া যায়। উক্ত তালিকায় বিবাহের উচ্চ সংখ্যা ৩৬টি, আর নিম্ন সংখ্যা ২টি।** পরিব্রাজক বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় নানা দেশের বহু বিবাহকারীগণের এক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নোটবুক হইতে বাছিয়া বাছিয়া পূর্ব বঙ্গের ৬৮ জন কুলীনের নাম পাইয়াছিলাম। তাহাতে দেখা যায়, উক্ত ৬৮ জনের মোট বিবাহ সংখ্যা ৯৬৭টি; বিবাহের উর্ধ্ব সংখ্যা ১০৭ এবং নিম্ন সংখ্যা ২টি। এতভিন্ন আরও অনেক নাম আমাদের জানা আছে, যাহা ঐ তালিকাভুক্ত হয় নাই। কুলীন কন্যাগণের বিবাহ সাধারণতঃ যৌবন অতীতেই হইয়া থাকে। অনেকের বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ হয় এমনও দেখা যায়। অনেক কুলীন রমণী বৃদ্ধকালে অবিবাহিতা থাকিয়াই মরিয়া থাকে। কোথাও বা বৃদ্ধের সহিত যুবতীর এবং বালকের সহিত বৃদ্ধ রমণীরও বিবাহ হয়।"

হিন্দুর মুখপত্র "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রে আমরা দেখিয়াছি, বিগত ১৩০২ সালের ১৭ই কার্ত্তিকের কাগজে, বিলাতের দোষ প্রদর্শন মানসে কোনও হিন্দু বাবু "বিবাহ ও ব্যভিচার" শীর্ষক প্রবন্ধে লেডী কুকের ৬টি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ৩ এবং ৬ষ্ঠ উক্তিতে লিখিয়াছেন–

"(ইউরোপের) বয়স যাহাদের ১০ হইতে ৩০ বৎসর, জারজ প্রসবিনীর ভিতর তাহাদের সংখ্যাই অধিক।

*** যেখানে রমণীর অধিক বয়সে বিবাহ হয় সেখানে ব্যভিচার ও জারজ পুত্র অধিক।"

আমরাও জিজ্ঞাসা করি, তাহার কারণ কি? তাহা সুসময়ে স্বামী গ্রহণ না করাতেই তো? হিন্দুর ঘরে যাহারা আজীবন স্বামীর মুখ দেখিল না, তাহাদের অত জারজগুলো কোথায় যায়? ওঃ সেগুলা বুঝি লুকিয়ে খেয়ে চুকিয়ে দিলে শুকিয়ে যায়! তা বেশ!! কিন্তু পরের বেলা যে চোখ্‌টা সাত সমুদ্র পরে যায়, ঘরের বেলা তা কি হয়?

বাড়ীর চুন! যেই প্রভাত, সেই পাড়ায় সংবাদ বিলি–"আজ অনেক রাতে জামাই বাবু এসে ছিলেন, নিতান্ত দরকারী কাজ থাকায় শেষ রাতেই চলে গেছেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার সঙ্গে পাড়ার আরও যে সকল দিদি মাসীরা সেই কুলীনের গলায় ঝুলিয়াছিল, তাদের অনেকেই এই উপায়ে যৌবন জ্বালায় জল দিতেছে ও ছেলেপিলের মাও হতেছে, কিন্তু যাদের মনে এতটুকুও ধর্ম জ্ঞান আছে, তারা কি ঐসব চণ্ডাল, চাষা, উড়ো মশাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাতে পারে? আমার মনে এ সকল ভাল লাগে না, তাই পোড়া কুল আমার তরেই শূল।[১]

---

১. চেষ্টা করিলে উল্লিখিত রূপ কুলীন কন্যা ও পুত্র অনেক পাওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রে বলে— বাগদান হওয়া মাত্রই স্ত্রীর উপরে স্বামীর স্বামীত্ব জন্মে।" (মনু সংহিতা॥২য় শ্লোক) আরও লেখা আছে, "স্বামী সেবা ভিন্ন স্ত্রীর কোনও ধর্ম কর্ম নাই।" (মনু ৫/১১৫)।

এমতাবস্থায় যে সকল কুলীন ঠাকুরেরা দেশ বিদেশে বিবাহ করিয়া ফিরেন, ও খাতা না দেখিয়া বিবাহ সংখ্যা বলিতে পারেন না, তাহাদের স্ত্রীগণ কাহার সেবা করেন? ওঃ! স্বামীর আদেশ পালনেও তো স্বামীর সেবা হয়। বোধ হয় বিদায়কালে কুলীন বাবুরা স্ত্রীগণকে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান লাভ করিতেও আদেশ দিয়া যান; কেননা তিনি তাহার পরম গুরু হইয়াছেন যে! হিন্দুর শাস্ত্রেও বিধান এই—

হরেৎ তত্র নিযক্তায়াং জাতঃ পুত্রো যথৌরস।

ক্ষত্রিকস্য তুত দ্বীজং ধর্ম্মতঃ পশবশ্চ সঃ।।"

(মুন সং হিতা-৯ অঃ ১৪৫ শ্লোক)।

অর্থাৎ "গুরুজনের দ্বারা আদেশ পাইয়া যদি কোন স্ত্রীর যথা বিধানে [পর পুরুষ দ্বারা] সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তবে ঐ পুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায় পৈত্রিক ধনের অধিকারী হইবে।" ঐরূপ আদেশ না দিয়াই বা তাদৃশ কুলীন ঠাকুরদিগের চারা কি?

সরসী সন্তাপ-সঙ্গীত

পোড়া কুলের কুলানলে পুড়ে পুড়ে হলেম সারা!
বিদেশী কুলীন স্বামী থাকতে আমি স্বামীহারা!!
পিতা মাতার মাথা খেয়ে,
বিদেশী কুল কিনতে যেয়ে,
আমারে অকূল পাথরে, ভাসাল দুজনায় তারা!
এ নব যৌবন সাগরে,
ফুটিয়াছে তরে তরে,
অমল কমল মালা, (কিন্তু হয়েছি ভ্রমর হারা!!
এ কুলের মুখে লাথি
ধিক্‌রে এ পোড়া জাতি,
আমারে অনল মূরতি সাজায়ে জ্বালাচ্ছে যারা!!!

সরলার যুক্তিদান

সরসীবালার একম্বিধ সঙ্গীত শুনিয়া সরলা কহিল, লো সরসী! থাক আর কাঁদিস নে। তোদের সকলের কান্নাকাটি শুনতে শুনতে আমার হঠাৎ ঐ পাড়ার বিনোদিনীর কথাটাও মনে প'ল। সেও এক দিন কাঁদতে কাঁদতে আমায় তার অনেক দুঃখের কথা বলেছিল। তাকেও কোন্ দেশের কোন্ হতভাগা বিয়ে ক'রে থুয়ে চাকরীতে গিয়েছে আর সেইখানেই সে মিন্‌সে নাকি কয়েকটি গোপীকা সাজায়ে নিজে কৃষ্ণ হয়েছে। এখানে বিনোদিনীর বয়সও কেবলমাত্র ১৪/১৫ বৎসর; কিন্তু সে মিনসে আর জীবনেও তার কথাটা মনে করিল না। আমি তার সেই সব কাঁদাকাটা শুনে যুক্তি দিয়াছি যে, আমাদের বাবুরা সকালে উঠিয়া যে পাঁচ সতীর নাম জপনা করেন, সেই রাধা, অহল্যা, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী–ইহারা সকলেই পর পুরুষের সঙ্গে রঙ্গলীলা করে বড় বড় সতী হ'য়ে গিয়েছেন, তুই বা অমন যৌবনে তাই না করে অত জ্বলিস পুড়িস ক্যান?[১]

তাই শুনে-যেমন তার মিন্‌সেটা বিদেশেই কৃষ্ণ হয়েছেন, সেও কতকটা নবীন কৃষ্ণকে লয়ে বাপের বাড়ীতেই দিব্যি রাধা সেজেছে।[২]

---

১. হিন্দুরা প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই যে মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা কেবল পাঁচটি স্ত্রীলোকের নাম। যথা–

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যা স্মরে নিত্যং মহাপাতক নাশনং"

বিষ্ণু বৈষ্ণবীর দৃষ্টান্ত

তোরা কি আরও ঐ কুসুমতলার বিধু বৈষ্ণবীকে চিনিসনে? বিধু শূদ্রের মেয়ে, খুব ছোট বেলা রাঁড়ী হয়। কিন্তু যেমন তার যৌবন ফুল ফুটেছে, আর অমনি গিয়ে বৈষ্ণব টোলায় জুটেছে! বিধু তো আর এখন বিধবা নেই, তার দেখি আর কোনও কাজেই বাধা নাই; বরং সে এখন জীবন্ত রাধা! বিধু যে এখন নিতি নূতন গোসাঁই ও বাবাজী নিয়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, চুলের হাতাটা ঝুলায়ে, বুকটা ফুলায়ে, পাছা দুখানা দুলায়ে, গেরুয়া বসন পরে বাহারের পরেও বাহার মেরে, বাড়ী বাড়ী এসে মুচকে মুচকে হেসে কৃষ্ণ পিরীতের গীত গায়; তার সুমধুর সুর শুনে ও রঙ্গ ঢঙ্গের অঙ্গ ভঙ্গি দেখে, কত বাবুর গালেই দেখি মাছি যায়। কৈ? তারে কেহই তো মন্দ বলে না। বরং সে এখন শূদ্রাণীর বদলে ঠাকুরাণী হয়েছে। বিধু যখন তার গোসাইর সুরে সুর ভাজায়ে, গোপী যন্ত্র বাজায়ে প্রেমের গান করে, তখন দেখি কত বাবুরা তার ভাবে বিভোর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাত রূপ ধরে! সে যে সকল রসাল গানগুলো গেয়ে বেড়ায়, তার মধ্যে ছোট তিনটা আমার মনে আছে, তাই শুনে তোরা যে যার বাড়ী যা।

[উক্ত পাঁচটি কন্যার নাম নিত্য স্মরণ করিলে নাকি মহাপাপও নাশ হয়। উক্ত পাঁচটি নারীই কিন্তু ব্যভিচারিণী ও পর পুরুষগামিনী ছিলেন, হিন্দুশাস্ত্র ইহা স্বর্ণাক্ষরে স্বীকার করেন। [আমার লেখা হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা পুস্তক দেখুন]

২. এ প্রকার বাবু সাহেবদিগের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। প্রতি শহর বাজার ও জমিদার বাটীতেই দেখা যায় যে, বহুতর উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারী হইতে সামান্য বেতনভোগী পেয়াদা, বরকন্দাজ, কনেষ্টবল, রশুয়ে বামুন ও ভাণ্ডারীগণ পর্যন্ত সেই পাপীয়সী বারাঙ্গনাদিগের আলতা মাখান পাদপদ্ম পূজায় আত্ম-মন সমর্পণ করিয়া, দেশ ভূম স্ত্রী-পরিবারকে জীবনের তরে ভুলিয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহাদের কোমলাঙ্গিনী অর্দ্ধাঙ্গিণীগণও কিছুদিন পরে যৌবনের প্রখর তরঙ্গাভিঘাতে সতীত্ব-রত্ন বিসর্জন দিয়া, চিরকালের তরে পাপ সাগরে নিমজ্জিত হন। মহাত্মা সাদী বলিয়াছেন–

মোবি আঁবে হেমায়েতরা কে হারগেজ-
না খাহাদ্ দিদ রুয়ে নেক বখ্তি॥
তন্ আসানী গুজিনাদ্ খেশ তনরা।
যনো ফরজন্দ বোগোজারাদ্ বসখ্তি॥"
অর্থাৎ-না দেখ সে বেহায়া জনায় কদাচন।
সৌভাগ্যের মুখ সে না দেখিবে কখন॥
দুঃখ দুর্দশায় যেই ছাড়িপরিবার-
দূরেতে স্বয়ং সুখে থাকে অনিবার॥

বিধু বৈষ্ণবীর প্রথম গান

কৃষ্ণ-প্রেম কর্‌বি যদি ওলো দিদি!
শোক সন্তাপ কিছুই রবে না।
আহা মরি মরি,
গৌরহরি নাম-তরী যার হবে না সার—
ভবে সে যতই করে,
যাকেই ধরে, কিছুতেই সে পার পাবে না।
যারা সব নাগর হারা—
আয় লো তোরা প্রেম নগরে হাট বসেছে—
যে যেমন নাগর চাবি—
তেমনি পাবি, কারু কাল বিফল যাবে না।

দ্বিতীয় গান

আয় তোরা যোগ বয়ে যায়-
আয় লো ত্বরায়, এমন সুযোগ আর পাবিনে!
আয় তোদের-
কেনে এ সুযোগ ছেড়ে—
চুলায় পড়ে মরিস পুড়ে দিবানিশি-
এসে এক প্রেমের কানাই,
ধর বলি তাই—প্রেমের কাঙ্গাল আর হবি নে।
মণি ও মুক্তা চেয়ে-
সুধন পেয়ে, অনাথ হয়ে কেনে র'লি,
যদি তাই বুঝিস্ এখন,
ও সখিগণ প্রেমের নাগর ধর লো চিনে॥

তৃতীয় গান

আয় সবে দিদি সকল! বল হরি বোল।
সকল জ্বালা শীতল হবে॥
এসে লে আচ্‌লা ঝোলা।
করোয়া মালা, হঠাৎ রাধা পার্‌বি হ'তে॥

তা হলে কত কৃষ্ণ,–
ব্রহ্মা বিষ্ণু তোদের পদে বান্ধা রবে।
আর কত দেব দৈত্য–
নিত্য নিত্য চরণ পদ্ম পূজবে তোদের।
কত জন প্রেমের নায়ে,
তোদের যেয়ে, ভব-তরঙ্গে মুক্তি পাবে॥
কুল বলে অকূল জলে,
ডুবিয়ে ম'লে কুল ধরে কেউ কূল পাবে না।
বিধু কয় কুলের গালে,
আগুন জ্বেলে, হরি বলে আয় নীরবে।
ও তোরা বিধুর দলে আয় লো সবে॥

তরঙ্গিণী, ওলো সরলা দিদি! তুই ভাবে আভাসে আমাদের যে সকল পরামর্শ দিলি, তাও বুঝি; বৈষ্ণবীদের যৌবন-লীলা দেখ্‌লে তো প্রাণটা তাই হতে চায়, কিন্তু তাদের বুড়োকেলে কষ্টের কথা মনে হলে যে ভয় হয়! নৈলে আমি সাধে কি চির চাতকিনী হয়েছি?

চতুর্থ বিলাপ

সাধে কি সেজেছি আমি চাতকিনী সৈ লো!
দহিছে হৃদয় মম প্রাণপতি বৈ লো!
অনন্ত বিরহানল,
হৃদয়েতে অবিরল,
জ্বলে যেন হলাহল, কাহারে তা কৈ লৌ!
পড়েছি ভীষণ রণে,
এ পোড়া যৌবন বনে,
বিন্ধিছে কন্টক মনে, অর কত সই লো!!
চাতকিনী শূন্য ভরে,
মেঘ-বারি বিনে মরে,
তবুও সে আশা করে, আমি তাও নই লো!
সদা মনে এই বলে,
মানের মুখে আগুন জ্বেলে,
কুল পুঁতে বকুলতলে, উড়ো পাখী হই লো!!

দুই যুবতীর প্রস্থান ও সরলার প্রশ্ন

তরঙ্গিণীর এবম্প্রকার হৃদয় বিদারিণী শোক-সঙ্গীত শুনিয়া সৌদামিনী ও সরসী নাম্নী যুবতীদ্বয় সাতিশয় শোক-সন্তপ্ত চিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইলেক; সরলা অতি বিষণ্ন বদনে পুনশ্চ কহিল, আঃ তরঙ্গিণী! তোর দুঃখটা শুনতে শুনতে আমারও বুকটা ফাটছে, মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখে আর কথা আসছে না! শুনেছি তোর পিতা, জেঠা, খুড়ো ঠাকুররা ও দাদাগুলা নাকি বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিত ও চাকুরে; ভাল ঐ দেশ বিদেশে কত বিধবা বিয়ের গুজোব শুনছি, তোর বিদ্বান বাপ, খুড়ো ও দাদাগুলো তাতে কিছু কিছু বিদ্যা বুদ্ধি খাটায় নাকি?

তরঙ্গিণীর উত্তর

আঃ পুড়ে যাক্ লো দিদি! যা শুনছিস তা সত্যি; তাদের ধর্মকর্ম লেখাঁপড়া, তর্ক ঝগড়া, বিদ্যে বুদ্ধি, শক্তি সাধ্যি, সুখ্যাতি পণ্ডিতি, আচার বিচার, বাবুগিরী বাহাদুরী, দান দয়া, ধ্যান তপস্যা, শিক্ষাদীক্ষা, মন্ত্রতন্ত্র, যোগাড়যন্ত্র, অস্ত্র জ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান সবই আছে; কিন্তু সে পরের বেলা, ঘরের বেলায় যেন সব কটাই কাঠের পুতুল, ব্রজ বাঁটুল! কেবল আমার ছোট ভাইটা সময় সময় চণ্ডী মণ্ডপে বসে বিধবা বিয়ের কথাটা নিয়ে ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কেউ তাকে তাল পাত্তেও দেয় না; তবে দু'এক দিন রাতের বেলা একজন দাড়িওয়ালা ব্রাহ্ম বাবু আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসে থাকেন; তিনি যেদিন ছোট দাদার পক্ষ হন, সেদিন আর আর বাবুদের কানে তুলো ও গায়ে মূলো যায়![১]

সরলা, বাবুরা যখন চণ্ডী মণ্ডপে ঐসব কথার তর্ক করেন, তুই তা শুনিস কিরূপে?

তরঙ্গিণী। লো দিদি তুই জানিস নে যে, ব্যারাম সারুক বা না সারুক, রোগীর চোখ দুটো কবিরাজের পথ পানেই ঘোরে; আমার মনে যে ব্যারাম হয়েছে লো! আমার গায়ে যে জ্বর এসেছে লো! হায়! আমি যে ব্যথায়

---

১. আমরা যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি যে, হিন্দু পুরুষের মধ্যে বার আনা ও স্ত্রীর মধ্যে পৌনে ষোল আনা লোক বিধবা বিবাহের জন্য একান্তই অন্তরে ইচ্ছুক আছেন; কিন্তু অন্তরে থাকিলেও প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে পারিবেন, এরূপ সাহসিক পুরুষের সংখ্যা ২/১ জন ব্যতীত পাওয়া ভার; অনেকের ফল পাকিয়াছে, বোঁটা খসিতেই বাকি। বিধবাগণ তো বরের তরে অনবরত বর মাগিতেছেই! কেবল কতকগুলি গোঁড়ার মোড়াতেই কাজের গোড়া ভাঙ্গা যাইতেছে।

ব্যথিত! তা বিধাতা ভিন্ন বুঝিবে কে? আমি সন্ধ্যা হলেই আড়ে অন্তরে বেড়াই, আর বারংবার সেই বাবুটার পথ পানেই চাই! পাড়ার ছোক্‌রা বাবুরা রোজ রাতের বেলা আমাদের চণ্ডী মণ্ডপে ঢোলক ও তবলা বাজায়ে গান গাইতে ও আমোদ প্রমোদ করতে আসেন, আমি তাই শুনার ছুতো করে গিয়ে ঐ কথাই শুনি![১]

আমার বাবা ঠাকুর একে ত ভট্টাচার্য, তাতে তর্কবাগীশ; আমার জেঠা খুড়োরাও কেহ বিদ্যাবাগীশ, কেহ বিদ্যাভূষণ, কেহ তর্করত্ন, তর্ক সিদ্ধান্ত, তর্ক চূড়ামণি, আরো কত কি তার অন্ত নাই। আমার বাবা ও খুড়োরা এই যে বুড়ো, তবু তাদের বাজে কথার হুড়ো দেখলে জ্ঞান বুদ্ধিটা গুঁড়ো হয়ে যায়। ঐ যে মাসে মাসে আমাদের বারোয়ারী ঘরে ধর্ম সভা না কি হয়, তাতে বক্তৃতা করতে করতে যখন বাবা ঠাকুর থাবার পর থাবা মারেন, তখন বোধ হয় শত সহস্র দেব দৈত্য এসে তাঁহার অঙ্গে ও কণ্ঠে ভর করেন। ঐ যে মুসলমান বেটারা কোন্ গাঁয়ে, কোন্ পাড়ায় গরু জবাই করে, তাই যখন ঠাকুর তাদের বিরুদ্ধে সুর ধরেন ও মাথার চুট্‌কিটা ঘুরায়ে তর্জন গর্জনে হুঙ্কার মারেন! তখন সমস্ত সংসারটা জুড়েই যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হয়! কিন্তু দিদি! যদি কোন ব্রাহ্ম কিম্বা বিদ্যাসাগরীয় লোক এসে তার মধ্যে বিধবা বিয়ের কথাটা তুলতে পারেন, আর অমনিই বুড়ো গুড়ো হয়ে ডুব মারেন! ক্রমেই ঠাকুর মেকুর[২] হয়ে বসেন ও আস্তে আস্তে মাথাটা হাঁটুর মধ্যে ঢোকান! যেমন প্রবল জড়ের পরে জগতের হঠাৎ নীরব নিস্তব্ধ অবস্থা ঘটে, ঠাকুরের বক্তৃতা ভঙ্গে সভা দেবীর কপালেও তাই বটে!!!

---

১. যে কোন বাটীতেই দুই একটি যুবতী বিধবা আছে, সেখানে দু'এক দিন বিধবা বিয়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেই, পাঠক এর সত্যাসত্য অনুমান করিতে পারিবেন। পাঠক! বিধবারা যেই জানিতে পারিবে যে, তুমি তাদের বিবাহের পক্ষপাতী, তখনই দেখিবে, সে অভাগিনীরা তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ভালবাসিতেছে। লেখক অনেক প্রমাণ দিতে পারেন। একটু নমুনা দেখুন; একটি উচ্চ বংশীয়া ভদ্র ঘরের হিন্দু বিধবা কন্যা আমাকে স্বহস্তে লিখিয়াছেন—

> আমার এমনি মন দুঃখ হইয়াছে যে, তাহা আপনি ভিন্ন আর কেহ জানে না।
>
> অন্তরে রহিল আমার অন্তরের ব্যথা।
>
> কেউ জানিবে না, রবে হৃদয়েই গাথা—" স. দেবী

তিনি প্রথম সংস্করণের বিধবা গঞ্জনা পাঠ করিয়া ঐ পত্রখানি লিখেন। সময় হইলে এইরূপ অনেক পত্র প্রকাশ হইবে।

২, মেকুর—বিড়াল।

বাজে কথায় নাচে বুড়ো, দৈত্যের মত মেরে হুড়ো,
আঃ পোড়া কপাল!
রাঁড়ের হয়ে দুটা কথা, ক'তেও বুড়োর ধরে মাথা,
ভেঙ্গে পড়ে গাল!!

আমার এক জেঠা মহাশয় হাকিমী কাজ করেন। শুনতে পাই, তিনি আসামী ফরেদীর এজাহার শুনেই মনের ভাবটা বুঝেন ও ষোল আনা হিসাব নিষ্পত্তি করেন। তাই তিনি কোনও বন্ধে ছন্দে যখন বাড়ী আসেন, আমি অমনি গিয়ে নানান বাহানায় তাঁহার সামনে বেড়াই, ও ভাবে আভাসে মনের ভাবটাও জানাই; কিন্তু আঃ কপাল! তখন দেখি, তাঁহার সমুদয় হাকিমী হুনোর শুকিয়ে লুকিয়ে যায়।

দেশ বিদেশে হাকিম জেঠার "অন্তর্যামী" নাম।
আমার কালে দেখি জেঠা শুধুই হুক্কারাম॥

আমার এক খুড়ো ঠাকুর বড় দাতা ও দয়ার সাগর। তিনি কত শত কাঙ্গাল গরীবকে অন্ন ও দেশে জলাভাব হলে কত দীঘি পুষ্করিণী কেটে দেন, দুঃখীর দুঃখটা যেই মনে জাগে, আর অম্‌নি তাঁহার হৃদয়খান মোমের মত লগ্‌তে লাগে। তাঁহার দান ও দয়ার কথা আর বলব কি? যদি এ সময় আমাদের দাতাকর্ণ ও মুসলমানদের হাতেমতাই জীবিত থাকতেন, তাঁরাও হার মানতেন। কিন্তু দিদি! মনে হলেও শেল ফোটে, বলতেও ছাতি ফাটে; আমার এই আজীবন দুঃখ দুর্দশা, ক্ষুধা-পিপাসার দিকে, সে দয়াল খুড়োর চোখে দুটা একদিনও প'ল না, আমার এ নিদারুণ গঞ্জনার কথা একদিনও তাঁর মনে উদয় হল না। তিনি পরের কালে দয়ার লাট, ঘরের কাজে শুক্‌নো কাঠ।

পরে পরে শুনি খুড়োর দাতা ঠাকুর নাম।
আমার সময় দেখি তিনি ঘেটো গঙ্গারাম॥

আমার এক দাদা মশাই বড় নামোয়ার ব্যারিষ্টার। লোকের মুখে শুন্‌তে পাই, তিনি হাকিমকে আইন শুনায়ে কত শত ফাঁসীর আসামী ও দায়মালী কয়েদীকে খালাস দেন। আবার তিনি পাশ করতে বিলেতে গিয়ে হিন্দুর আচার ও শাস্ত্র ছাড়া কত চিজ বস্তু, গোমাংস খেয়ে, নিজের বক্তৃতাবলে হজম করেছেন ও যুক্তিবলে মুক্তি পেয়েছেন। আমি তাঁর এই সকল গুণপনা শুনে মনে মনে কতই না আনাগোনা করি! তাই যেমন কখনও তিনি বাড়ী আসেন, আর অমনি বড় আশায় বুক বেঁন্ধে তাঁর সামনে যাই, ও ভাবে ভঙ্গিতে আশায় আভাসে, এই কথায় সেই কথায়, আপন বৈধব্য জেলের যন্ত্রণাটাও জানাই! কিন্তু হা পোড়া

কপাল! তিনিও দেখি শুধু সাইবী ফ্যাসানে সাইবী ভূষণে, সাইবী আসনে বসে সাইবী নজরে একবার আমার দিকে চেয়ে কেবল বলেন, "কি তরঙ্গিণী! ভাল আছিস তো?" আর কিছুই না! তখন সে দাদার বিলাতী শক্তি, বিলাতী ভক্তি, বিলাতী যুক্তি, সকল যেন ভস্মে মিশে যায়!

অন্যের বেলায় দাদা সুরেন্দ্র[১] ও রাম।[২]
আমার সময় তিনি ঘুণে ধরা থাম॥

আমার এক দাদা বড়ই পণ্ডিত; তাই তিনি কত শত বই পুস্তক ও খবরের কাগজ লিখে জগতটাকে মাতান। তিনি বিদ্যার বলে মাটির পুতুলকেও পরমেশ্বর করে তোলেন, ও ধ্যানবলে কাদার ঠাকুরগুলোকেও জীবন্ত করে ফেলেন। আকাশের চন্দ্র সূর্যও তাঁহার কলমের গোলাম। তিনি পাণ্ডিত্য জোরে মেঘকে ভিস্তি ও পবনকে ঝাড়ুদার করেন; আবার বড় বড় দৈত্যগুলোকেও হাত বাড়িয়ে ধরেন; দেশে জল না হলে কলমের একটি আঁচড়েই কত ডাঙ্গাকে গঙ্গা করে দেন। লোকের যাওয়া আসার কষ্ট হ'লে একটা ইঙ্গিতেই রাস্তা, পথ, রেল, ষ্টিমার ও কত খাল বিল নালার উপরে পুল হয়ে যায়! আমিও লেখাপড়া জানি, তাই তাঁর লেখা পুস্তক পুস্তিকা ও খবরের কাগজ পড়ে দেখেছি, তিনি যখন যা কিছু লিখতে কলম ধরেন, তখন তাকে যা ইচ্ছা তাই করেন। তাঁর কলমের তেজে বড় বড় পাহাড়গুলা তিল অপেক্ষা ছোট, আর অতি ছোট ছোট তিলগুলা পাহাড় অপেক্ষাও দশ বিশ গুণ বড় হয়। তিনি যখন ধর্মের কথা লিখেন, তখন বোধ হয় স্বয়ং ধর্মদেব তাঁহার অঙ্গুলির মধ্যে লুকায়ে থেকে লেখান; আবার যখন রস-প্রসঙ্গ লিখেন, তখন সমস্ত জগতটাই রসময় হইয়া যায়। আরও ঐ যে ইংরেজ বেটারা কোন্ দেশে থেকে এসে ভারতে রাজত্ব করছে, তাই বিদ্বান দাদা "কঙ্গরস" না "রঙ্গরস" লিখে তাদিগেও এদেশ থেকে বচ্ছরে কতবার তেড়িয়ে দেন। বই পুস্তকে ভুল পেলে দাদা কতজনকে জীবন্তই নরকে পাঠান, আবার ভক্তগণকে একেবারে সশরীরে স্বর্গে উঠান। তিনি বিদ্যাবলে পাতালের জলকে আকাশে যোলেন, ও আকাশের তারা পাতালের বালিগুলাও মুখে মুখেই গুণে ফেলেন। মাটির মধ্যে সমুদ্র গর্ভে কোথায় কি আছে, তাঁহার কাছে নিমিষের মধ্যে শুনা যায়, তাঁহার কাগজ পড়লে মানুষে আপন জীবন মরণেরও খবর পায়। আবার টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেলে তাঁর সাহায্যের ভাণ্ডারে দাখিল হলেই কত শত টাকা পাওয়া যায়। আর কত কব? আমার বিদ্বান্ দাদার সমুদয় গুণের হিসাব দিতে দেবতারও ক্ষমতা নেই! কিন্তু হায়! কতেও প্রাণটা ফেটে যায়!! এই আমি অভাগিনী, চির দুঃখিনী, পাপিনী, তাপিনী, কলঙ্কিনী, অনাথিনী ও আজীবন

১. সুরেন্দ নাথ ব্যানার্জি।
২. সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাহমোহন রায়।

তৃষ্ণাতুরা চাতকিনী যে কতবার প্রত্যহ সেই অন্তর্যামী, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞা দাদার সামনে ঘুরি, এ ভাবে সে ভাবে মনের ভাবটাও ব্যক্ত করি; দাদার নয়ন দুটা কত বার আমার উপর পড়ছে, তাঁর সামনেই কত বার আমার চোখ দুটো হতে জলধারা ঝর্‌ছে ওঃ! তখন যে বিশ্ব-বিজয়ী দাদার জ্ঞান-ভাণ্ডারে একটি তিল মাত্র জ্ঞান-কণিকাও থাকে না! উহ! তখন তিনি কেবল একটি রায়বাঁশ—ভক্ত দাস!!!

দাদা মোর জ্ঞানের ভাণ্ডার,
দাদা মোর ভবের কাণ্ডার;
আর শুনি দাদা মোর রণজয়ী ঘোড়া!
তাই বান্ধি আশাতে হৃদয়,
দাদা মোর হবে গো সদয়,
তাও দেখি সেও দাদা মোর কালে ভ্যাড়া!!

আমার এক দাদা দিগ্বিজয়ী কবিরাজ; তিনি যে কত বড় বড় ব্যারামের ঔষধ তৈয়ার করেন তার শুমার করে এমন মাথা কার? দাদার সমস্ত ঔষধগুলিই অমৃতময়, তার নামেই কত বড় বড় ব্যারামের অন্তর্ধান হয়; সে ওষুধ খেয়ে কত ৮০ বচ্ছরে বুড়োও যৌবন এবং মরা মানুষ জীবন পায়। তিনি ধাতুদৌর্বল্যের যে সকল সোমরস ও হাকিমী মসলা প্রস্তুত করেন, তা খেয়ে হাজার হাজার নপুংসক পুরুষও হাতীর মত তেজীয়ান হয় ও মেয়ে মানুষে খেলে মত্ত মাতঙ্গিনীবৎ বা একেবারে কুন্তী, দ্রৌপদী, মা গঙ্গা বা মহাবিদ্যার মত শক্তি পায়। তিনি হাত ধরেই রোগীর ধাত বোঝেন, চোখ দেখেই রোগ চেনেন, মুখ দেখলেই বুকের ভিতরকার ব্যারাম জানতে পারেন, তাই অনেকেই তাকে 'ধন্বন্তরি' বলেও ডাকে। দাদার এই সব গুণপনা দেখে শুনে আমার অন্তরেও সময় সময় একটু আশার সঞ্চার হয়; তাই সারাদিন চাকে পাকে ফাঁকে ফোঁকে নানান উছিলাতে তাঁর সামনে বেড়াই, আবার জ্বলের ছুঁতো করে মুখটা বুকটা কখনো বা হাতটা ধরায়েও দেখাই; আশাটা এই,–দাদা আমার বড় দয়াল! কত শত রোগীকে বিনি টাকায় ওষুধ দেন, যদি কোন গতিকে আমার মনোগত রোগটা বুঝতে পারেন, তবে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা যোগাড় করবেন। হা রে অদৃষ্ট পোড়া! তাও দেখি সে ধন্বন্তরি দাদাও আমার কপালে ধোড়া!! আর কব কি ছাই?

"লঙ্কায় যেয়ে দরিদ্রে, পেয়ে এলেন হরিদ্রে"-আমারও হয় তাই! দাদা আমার মুখটা বুকটা বেশ করে দেখেন, হাতটা ধরেও কতক্ষণ থাকেন, কিন্তু যে নিদারুণ ব্যারামে আমার দেহ মন জর্জরিত, তিনি তার কিছুই বুঝতে পারেন না; তখন তাঁর কবিরাজী, ডাক্তারী, হাকিমী, অবধৌতি ইত্যাদি সকল চিকিৎসা ও সকল বুদ্ধিতেই আগুন জ্বালি! দাদা আমায় কত টিপে টেপে দেখে, কয়টি বুটের মত বড়ি দেন, আমি তখনি তা গোবরেখানায় ফেলি, ও তাঁর সকল জ্ঞান গুণকে দু পা দিয়ে ঠেলি!

পঞ্চম বিলাপ

আমায় "আমার" বলতে নাই লো![1]
লোকে বলে সবই আছে, আমি তো না পাই লো!!
জেঠা খুড়ো গুরুজন,
গণ্য মান্য দাদাগণ,
সকলি পাষাণ মন; সবের মাথা খাই লো!!
পরে পরে কতই শুনি
কেহ ঋষি কেহ মুনি,
কেহ জ্ঞানী কেহ গুণী, সে জ্ঞানেতে ছাই লো!
যে তাপে তাপিত মন,
যে অনলে জ্বালাতন,
বুঝে না তা যেই জন, তাহে নাহি চাই লো!!

অদৃষ্টবাদ

সরলা। উহুঃ! থাক্ লো তরঙ্গিণী! আর সকলকে শাপিস্ কাটিস্ নে, সব তোর অদৃষ্টের দোষ, নইলে অত ছোট বয়সে রাঁড় হবি ক্যান? কপাল ভাল হলে একটাতেই হয়, মন্দ হলে দশ বার বিয়ে দিলেও সুখ হয় না।[2]

তরঙ্গিণী—তোরা তাই তো ক'বি। তোদের যে বুকটা ভরা সুখটা আছে, তাই এক দেখিস আর দেখিস নে! ঐ যে আমার তোত্‌লা খুড়ো এই বুড়ো বয়সেই কতটা কল্লে; তার যে কতটা মল, অর কতটা হ'ল! এও বৎসর তিনি

---

১. একটি কায়স্থ কন্যার স্বহস্তে লিখিত পত্রাংশ দেখুন–

আমাদের এমন আর কেহ নাই যে দুঃখ বুঝিবে ও একদিনের জন্য আমার বলিবে। আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়, এমন আর কেহ নাই। সা-বা-দঃ

২. জ্ঞানান্ধ হিন্দুগণ বিধবাদিগকে এমনি নানা প্রকার ভিত্তিহীন উক্তি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

গৃহশূন্য হন; অমন তিন কেলে বুড়োর বিয়েতে অনেক টাকার শ্রাদ্ধ হয় ব'লে আমার বাবা ঠাকুর একটু কাড়ুম কুড়ুম করেছিলেন; খুড়ো তা টের পেয়ে অমনিই অন্নজল ত্যাগ কল্লেন, ও ঘর ছেড়ে বাইরে শোয়া ধল্লেন; তাই একদিন বাবা ঠাকুর ও বাড়ীর সকলে কত কাকুতি মিনতি করে বুড়ো খুড়োকে অন্নজল খেতে ও ঘরে শুতে বলতে ছিলেন; খুড়ো তখন অমনি গর্জে গর্জে বল্লেন যে, আঃ আঃ আঃ আঃ আঃ আমি আঃ আঃ আঃ আ-র ভাঃ ভাঃ ভাঃ ভ্ ভাত খাঃ খাঃ খাঃ খাঃ খা খাব না, ঘঃ ঘঃ ঘঃ ঘঃ ঘঃ ঘঃ অ-ঘরেও শোঃ শোঃ শোঃ ও -শোব না। আঃ আঃ আঃ আঃ আমার মঃ মঃ মঃ মঃ মঃ মনে যাঃ যাঃ যাঃ যাঃ বঃ বঃ বঃ ব্ব অ-বলে, তাঃ ত্তাঃ ত্তা ত্তাই কঃ ক্কঃ কঃ কঃ ক্কঃ অ কঃ কর্‌ব।"[১] বাবা আমার তোত্‌লা খুড়োর এই মত "তোত্তোৎ খোঁত খোঁত" হুড়োহুড়ির ঘায় না বাঁচতে পেরে সেদিন হাজার দুই টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে ১১ বচ্ছুরে এক ছুঁড়ীর সাথে তার বিয়ে দিয়েছেন; বুড়ো খুড়ো এখন তাই নিয়ে ঐ কামরাটায় পড়েই তা দেন।[২]

খুড়োদের বুড়োকালেও অদৃষ্ট দোষ ঘটে না, রাঁড়ীদের জোয়ানকালেই সে কথা উঠে ক্যান? মিন্‌সেরাও কেন বৌ মলে অদৃষ্ট ধিয়ায়ে থাকে না? তারা যে রাতটাও পোহাতে দেয় না।

বল দেখি লো, যদি কেউ এক বাসন ভাত নিয়ে খেতে বসা মাত্রই তাতে গাঁদী পড়ে, তবে কি সে অদৃষ্টের দোষ দিয়ে আর ভাত খাবে না? বৌ মলে মিন্‌সেদের কোন কথা হয় না, রাঁড় হ'লে আমরাই কি পাথর হই? বল দেখি সরলা! আবার বিয়ে হলে স্বামীর সঙ্গে আমরা কোন্ কাজে অপারগ হই যে, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ!

আমার সেজে দাদার বৌটাও আমার মত ভরা যুবতী; তা থাকতেও যে তিনি বাজারে গিয়ে কত রাঁড়ের বাড়ী পাহারা খাটেন, এসব শুনে এ পোড়া পরাণে কি কিছুই বলে না? এই যে পূজার বন্ধে আমার চেকরে দাদারা বাড়ী এয়েছেন; তাঁরা সেগুলোকে সাথেই রাখতেন, তবু তো একটা দিন ভিন্ন ভিন্ন ঘরে থাকেন না। তাঁহারা বিদেশ থেকে সকলেই আমার জন্য এক এক জোড়া ঠেটী এনেছেন, বল দেখি আমি সেই ঠেটী পরে কি বুটী নিয়ে শোব?

একটি দিবস বাবুদিগের সয় না উপবাস।
বল তো মোরা কেমনে উপোস করব বার মাস?

---

১. "আমি আর ভাত খাব না, ঘরেও শোব না, আমার মনে যা বলে তাই করব।"

২. বুড়ো বিবাহের প্রমাণ এই পুস্তকের প্রথমাংশে ইতিপূর্বে বর্ণীত হইয়াছে।

ধর্মানুষ্ঠান দর্শনেও বিপদ

হা সরলা! আর কব কি, এ নির্মম, নিষ্ঠুর জাতির মনে কি মায়া মমতা আছে? রাঁড়গুলোকে যা কখন সোদ্‌রে খেতে ও ছুঁতে দিবে না, তাই সব তাদের সামনে সাজা'য়ে গোজায়ে দেখায়। বল তো, খিদের সময় খাবার বস্তু দেখলে খিদেটা কতগুণ হয়?

সরলা হ্যাঁ লো! সে কি যে তোদের সামনে সাজায়ে রাখে, তোদের ছুঁতে খেতে দেয় না?

তরঙ্গিণী–তো বুঝি আর তা দেখিস্ নি; যদি না দেখে থাকিস, তবে ঐ কালী ঘরখানায় যা দেখে আয় কত বড় মিন্‌সেটা উলঙ্গ, চিত হয়ে, হা করা ল্যাংটা কালীর পার তলে কত বড় একটা কি বের করে দে প'ড়ে আছে; তাই তে সিঁদুরের ফোঁটা দে পোড়া রাঁড়ীদেরই পূজতে হয়!

রাজা নাই রাজ্য নাই রাণী নাম ধরি!

স্বামী নাই শুধু পোড়া লিঙ্গ পূজে মরি!![১]

আবার প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর যোগে সেই ল্যাংটা কালী মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বাবুরা নামোয়ার নামোয়ার কবির দল আনিয়া থাকেন; সেই কবির কৃষ্ণ বোল শুনলে নাকি ঐ ল্যাংটা মা আনন্দে গলেন। সে গানের যে লণ্ডভণ্ড কারখানা এই পোড়া চোখে দেখেছি ও কানে শুনেছি লো! তা কি আর মুখে বলা যায়? সে দলের যে সকল চড়া চড়া দেবতা ও খাড়া খাড়া দেবী, ডালিম গোলা রাঁধা ও বংশীধারী হরি, কুচল কুচি সীতা ও ধনুক ভাঙ্গা রাম, বকুল মুকুল গোপী ও লীলা প্যাগলা শ্যাম হলুদাঙ্গ নাগর, কদম রঙ্গী নাগরী এসে থাকে লো! তাদের দেখলে কি আর পরাণটা ধড়ে দাঁড়ায়? সে কেবল খাঁচার পাখীর মত এই দেহটার

---

১. হয়তো অনেক সমালোচকের কাছে তাহাদের করা ও দেখা অপেক্ষা আমাদের ধারা ও লেখাটাই অধিক অশ্লীল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আমরা স্বয়ং নদীয়ার অন্তর্গত কোন কোন ভদ্র হিন্দু পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ঘাটে, যাতায়াত পথের ধারেই আগলা ঘরে শিব কালীর উলঙ্গ ও বিরাট মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছি। কালী দেবী জিহ্বা বাহির করিয়া উলঙ্গাবস্থায় শিবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা এবং শিবের কর্দম নির্মিত প্রকাণ্ড লিঙ্গ উত্তেজিত অবস্থায় পথের দিকেই ফিরান রহিয়াছে, লিঙ্গে সিঁদুরের ফোঁটাও রেখে গিয়াছে; শুনা গেল, তাহা বিধবারাই দিয়া পূজা করে। বিধবা ব্রাহ্মণীদিগের এক দর্শনীয় দিন লিঙ্গ পূজার কথা তো সকলেই বিদিত। ক্ষুধায় কাতর শিশুর হস্তে খাদ্য বস্তু দিলে বা তাহাকে দেখাইয়া কিছু খেলে, তাহার ক্ষুধানল কত দূর প্রবল হয়, তাহা বোধ হয় সজ্ঞান পাঠক বেশ বুঝিয়াছেন, এমন অপূর্ব ধর্মানুষ্ঠান ও সভ্যতাকে শত শত ধন্যবাদ!!

মধ্যেই ঝটফটায়ে বেড়ায়। যখন্ সেই ভুবন মোহিনী নব নাগরীগণ, উলঙ্গ শিব কালীর সামনে কখনো বাবুদিগের দিকে মুখ ফিরায়ে মাজা ঘুরায়ে, বুক ফুলায়ে, পাছা দুলায়ে, পড়লে পড়লে চরণ হেলায়ে ছোট ছোট করে হাঁটু নোলায়ে, আলতা মাখান হাতগুলা সীতায় ঠেসে, লাল গোলাবী গালগুলায় মুচকে মুচকে হেসে মুক্তা-বিনিন্দিত দাঁতগুলার মন্দ মন্দ ঝলকে, ও কাজল দেওয়া বাঁকা নয়নের পুরুষ মারা পলকে, পুলকে পুলকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাকে পাকে নাচ করেন ও মধুর দলনে মধুর গলনে গ'লে কৃষ্ণ প্রেমের সুর ধরেন, তখন দেখেছি–প্রদীপ শিখাবত সেই নবীন মোহিনীগণের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আসরের পুরুষ পতঙ্গদল কিছু কালের তরে ধড়ে প্রাণ থাকতেও মরেন। আরও যখন সেই অপ্সরীগণ, বারি মত সারি সারি দাঁড়ায়ে ও নাচ দেখায়ে বাবু-বাবুনীদিগকে মাতান, গায়ক দেবতা দলও কি এক অভিনব অঙ্গ ভঙ্গি দিয়ে তাদের পাছেই লাফান আর গান–

হায় রে-মরি-হায় রে হায়! ও –, হায়!" আবার সময় সময় দৈত্যের মত এক মিন্‌সে ঝটাপট আসরে উঠেই "চুপ চুপ ভাই রে" ব'লে তড়াতড় ছড়াছড় "ছড়া" না কি পড়ে, তা শুনলে ৮০ বচ্ছুরে বুড়োরাও তেজে উচ্‌লে পড়ে, একশ বচ্ছুরে মরাতেও পরাণ পেয়ে নড়ে।

আরও সেই কবিদারদের দুই দলে যখন পাল্লা বাধে, তখন যে সকল মোটামুটি ফোটাফুটি কৃষ্ণবোল, খোলাখোল, খেউড় ছড়া, পাতাল ফোঁড়া, আকাশ নড়া, বিচার দেবী পাড়ার আচার, পাঁচালী টপ্পা, ঝপ্পা হয়; তা শুনলে পিরীত প্রণয়ের ডাক্তারী, কবিরাজী, লম্বাই, চওড়াই, কল, কৌশল সবই শেখা যায়; আমরা সধবা, বিধবা, ছুঁড়ী, বুড়ী সকলে একটা পাতলা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে, বসে তা সকল শুনি ও দেখি। যেসব সধবা ও উড়োখলা বিধবারা সমস্ত কলা কৌশল শিখে বাড়ী যান, তারা মা কালীর বরে, কলের জোরে সদ্যই যেয়ে বৈকুণ্ঠ সুখ পান; কিন্তু হা দিদি! বল দেখি, আমি ঐ সকল কলা কৌশল শিখে কোন্ হাটে, কোন্ ঘাটে, কোন্ মাঠে, আর কার খাটে খাটাব?

(অহো)! শুনিলে সে কবি গান,

উথলি বিরহ বাণ, ভাসায় বিধবা প্রাণ,

আজীবন হায়!

(কিছু) দয়া ধর্ম এ ভুবনে,

থাকিলে হিন্দু মনে, তবে কি বিধবা সনে,
কবি গান গায়?[১]

লো দিদি সরলা! যদি আর একটু ভালরূপে দেখতে চাস, তবে ঐ রথখোলা ও ঠাকুর ঘরগুলাতে যা, গিয়ে দ্যাখ সেখানে কত বড় বড় দেব দেবী একেবারে গা'র কাপড় তুলে বুকোবুকি পরাণ খুলে জগতকে যোগ শিখাচ্ছে। তাদের সেই মুখে মুখে, বুকে বুক, পায়ে পা, আরও কত গায়ে গা লাগান, দেখলে মনে যা বলে, তা কি আর জানিস নে?

জগন্নাথের পোড়া রথের কাণ্ডে নজর প'লে!
মনের আগুন, সহস্র গুণ, অমনি উঠে জ্বলে!!

আরও ঐ ঠাকুর ঘরগুলিতে যে সকল দেব দেবীরা পাশাপাশি বসে, হাসাহাসি ওঠাসাঠাসি করে ভক্ত মেয়ে পুরুষকে ধ্যান, জ্ঞান শিখাচ্ছে, তারা যেন আর কখনো বুড়ো হয়নি। তাদের সেই কদমগোলা বুক, হাসিভরা মুখ, উপ্‌রো

---

১. "করা ও দেখায় পুণ্য, ধরা ও লেখায় পাপ"—অনেক মহাত্মা হয় ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া লেখকের প্রতি দন্ত কিড়মিড়, চক্ষু লাল এবং বন্দুক কামানের যোগাড় করিবেন। কেননা, কুল্লো হাক্কোন, মার্রোন।" (হাদীস) অর্থাৎ প্রত্যেক সত্য কথাই তিক্ত। কিন্তু ঔষধ তিক্ত হইলেও তাহার গুণ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের নিকট অতীব মধুর। তাই বলি, আমাদের ভাষা ও রচনা অমিষ্ট হইলেও, যিনি উদ্দেশ্য গ্রহণ এবং আগ পাছ ভাবিয়া হিন্দু পল্লীস্থ কবির গান শ্রবণ করিবেন, তিনি জীবনেও ইহার প্রতিবাদের সময় পাইবে না। সুন্দরী সুন্দরী বেশ্যা ও ষণ্ডা গুণ্ডা পুরুষদিগের দ্বারাই বর্তমান কবি গানের দল গঠিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করণার্থে ও পুণ্যাহরণার্থে বাড়ীতে ও বাড়ীর নিকটে কবির আসর করেন, (আমরা যদিও কতকগুলি বিখ্যাত আসরের নাম জানি, কিন্তু অনাবশ্যকবোধে এস্থলে প্রকাশ করব না)। নরাকার পিশাচ ভিন্ন কবির গান মুখে উচ্চারণ করিতে আর কেহই পারে না। হাজার হাজার হিন্দু ভদ্রাভদ্র নরনারী এবং লম্পট শ্রেণীর গুণ্ডা মুসলমানদিগের সম্মুখে যখন সেই পিশাচিনী বেশ্যাগণ, অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি দিয়া নাচিতে নাচিতে, পৈশাচিক ভাষায় বিবিধ অশ্লীল সঙ্গীত গাইতে থাকে, তখন পিশাচ প্রকৃতি গায়ক পুরুষগণ দক্ষিণ হস্তে স্ব স্ব কোমর ও বাম হস্তে স্ব স্ব *** ধরিয়া তাহাদের আন্দোলিত নিতম্ব শ্রেণীর অতি সন্নিকটেই কটি সঞ্চালন এবং বহুবিধ ভাবভঙ্গি দ্বারা উপস্থিত নরনারীগণকে প্রবল রস-প্রবাহে ভাসমান করিয়া দেয়। আবার হিন্দুর কোনও একখানি প্রধান পত্রিকাতেও বর্তমান কবি গানের দোষ কীর্তন দেখিয়াছি। আমাদের দেশে কোনও নামোয়ার ঠাকুর দোল উপলক্ষে বাড়ীতে উক্ত গানের আসর করেন (অবশ্য ভদ্র রমণীগণের জন্যও স্থান ছিল)। রাত্রি ১২টার পর যখন কৃষ্ণ বোলের ঝুল উঠিল, অমনি পর্দার মধ্যে খলবলির ফোয়ারা ছুটিল, তখন ঠাকুরের চোখের ছানীও কাটিল; আর তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা-"এমন কাজ আর করিব না।"

উপরি সুখ, ঠোঁটের টুক্‌টুক দেখলে কি আর এ অভাগিনীদের পোড়া মনে কিছুই বলে না?[১]

নির্দয় হিন্দুর দল, নির্ম্মম নীরস!
ভাবে যে রাঁড়ীরা নাহি বুঝে রঙ্গরস!!

রোজ রাতের বেলা পাড়ার ছোকরা ও রসিক বাবুরা এসে চণ্ডী মণ্ডপে বসে আমোদ প্রমোদ, গান বাজনা করেন; আবার হর বচ্ছর এই পূজার বন্ধে ঐ যে সম্মুখীন বাড়ীর খড় ঘেরা জায়গাটায় যাত্রা গান হয়! পোড়া পরাণে বোঝে না, তাই সময় সময় গিয়ে সেই গান শুনি! এই সেদিন সেই নামোয়ার যাত্রা দলটা এসেছিল, অনেক টাকা পেয়ে তারা গানও গেয়েছিল; কিন্তু দিদি! বৌদের আমোদে পড়ে তাই শুনে আমার উনো আগুন দুনো হ'য়েছে। সে পোড়া গানেও দেখি ঐ পিরীত প্রণয়ের কথাই পোরা! কোন দেবী কোন ঘাটে কোন মাঠে গেল, কোন দেবতার মনে কোন্ ধর্ম এল, কোন্ দেবীকে কোন্ দেব্‌তা ধল্লে, কোন্ কলে কোন্ বলে কি ক'ল্লে এ সব শুনতে শুন্‌তে তখনি মনে হয় যে, আমিও যেয়ে ঐ মত দেবী হই, ও ভাল ভাল দুই চারিটা দেব্‌তা বেছে লই!

শুনে দেব দেবীদের পিরীত কাহিনী!
হয়েছে সে দিন থেকে পূর্ণ পাগলিনী!!

লো দিদি! আরো সে আখ্‌ড়ায় যে সকল পরাণ ভরা যুবা যুবা নাগর দেখ্‌লেম, তা কি আর জীবনে ভুল্‌ব? তাদের সেই মন ভুলান ছবিগুলা

---

১. যাহারা ইহা পাঠ করিয়া সন্দিগ্ধ চিত্ত হইবেন, তাহাদিগকে আমরা যশোহর– ঘোড়াগাছা, রাজারহাট, পদ্মপুকুরিয়া, নড়াইল ও বজরাপুর ইত্যাদি স্থানে প্রতিষ্ঠিত রথসমূহের এবং বৈডাঙ্গার বাসখোলাস্থ মূর্তিসমূহ একবার দর্শন করিতে অনুরোধ করি। ঠিক যেভাবে স্ত্রী পুরুষ সহবাস করে, উক্ত রথসমূহে প্রকাশ্য স্থানে তাদৃশ অনেক মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঘোড়াগাছার রথে কতকগুলি যুবতী মূর্তি সম্মুখে পরুন বস্ত্র তুলিয়া দুই হস্ত দ্বারা স্ব স্ব অঙ্গ বিস্তার করত জগতকে দেখাইতেছেন। পদ্মপুকুরিয়ার রথে রাধা কৃষ্ণ বিবস্ত্রাবস্থায় সঙ্গম করিতেছেন; আর একটি যুবতী স্বীয় গুপ্তাঙ্গ-দ্বার দুই হস্ত দ্বারা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, কতকগুলি পুরুষ তাহা উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। এরূপ হাজার হাজার ভদ্র হিন্দুর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত বীভৎস মূর্তি সকল দেখান যাইতে পারে। হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ, মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যা, গুরু-শিষ্য, ছুঁড়ী-বুড়ী, যুবতী প্রৌঢ়া, সধবা বিধবা, পুণ্য সঞ্চয়ার্থে উক্ত মূর্তিসমূহ দর্শন করিয়া পুলকিতচিত্তে "উলু উলু, হরিবোল হরিবোল" বলিয়া জগত মাতাইয়া থাকেন। বিজ্ঞ যুবক পাঠক! উক্ত রূপ রথ ও যুগল যোগ দর্শনে যুবক যুবতীর মনে কোন্ জ্বলন্ত ধর্ম প্রকাশ পায়, তোমরাই তাহার ডিক্রী-ডিসমিস যা হয় তা কর। লেখক কিন্তু তিক্ত ভাষায় সত্য ঘটনা ব্যক্ত করিয়াই প্রস্থান!!

ছায়ার মত আমার চোখ দুটা ও মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে। হায়! সে দিনকার সেই ছোক্‌রা ও রসিক বাবুদের কোকিল কাকলিবত রসপোরা সুমধুর গানে ও নয়নের বীঙ্কম-বাণে আমার মনে ধু ধু করে যে আগুন জ্বলেছে লো! তা আর কখন নিভবে না! আমার সঙ্গে যে সব সধবা যুবতীরা সে গান শুনলো তারা তখনি ঘরে যেয়েই সে আগুন নিবায় লো, কেবল পোড়া যাত্রায় আমি অভাগিনীর দুঃখের মাত্রাই বেশী করেছে!!!

(হায়!) রসিক যুবক দলে
গাইল কোকিল বোলে, তা শুনে পরাণ জ্বলে—
যায় অনিবার!
(সেই) মধুর সঙ্গীতে মোর,
মনেতে মোহের ডোর, গাঁথিয়ে করেছে ঘোর,
বাঁচিনে লো আর!!
(তারা) রসের সুতান ছেড়ে,
হৃদয়-পিঞ্জরা ফেড়ে লইয়া গিয়াছে কেড়ে,
পরাণ আমার!!![১]

---

১. কোন কোন গীত বাদ্য দ্বারা যে শীঘ্রই ইন্দ্রিয়গণের আসক্তি জন্মে হিন্দুর হর্তাকর্তা মহাত্মা মনু সে রহস্য ভেদ করিয়া দিয়াছেন, (দেখ-মনু সং হিতাঃ ৪ অঃ ১৫ শ্লোক।) বর্তমান কালে যে প্রণালীতে যে শ্রেণীর লোক দ্বারা গানের দল গঠিত হইয়া থাকে, তাহা সর্বজনবিদিত। যে সকল গীত বাদ্য শুনিয়া কঠিনমনা পুরুষগণ কামানলে জ্বালাতন ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে কোমলপ্রাণা কামিনীগণের মনে কোন্ ভাবের উদয় হইয়া থাকে, সে কথা কি বিজ্ঞ পাঠক এখনো বুঝেন নাই? পুরুষ দর্শন মাত্রেই স্ত্রীলোকেরা তাহা সম্ভোগার্থে চঞ্চলামনা হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের স্নেহ-শূন্যতা ঘটিয়া থাকে(দেখুন–মনু সংহিতা ৯। ১৪-১৬)

ঐরূপ স্থলে তরুণ বয়স্কা কোমলাঙ্গিনীগণ যখন সেই সুন্দর, সুপুরুষদিগের নিকটে বিবিধ রসপূর্ণ সুমধুর সঙ্গীতও শুনিয়া থাকে, তখন তাহাদিগের হৃদয় যে পুরুষ মিলনামৃত লালসায় অধীরা হইয়া থাকে, ইহা স্থির নিশ্চিত নহে কি? আমাদের মুসলমান সমাজের যে কতিপয় কুলাহঙ্কারী অদ্ভুত জীবেরা বিধবা বিবাহের শত্রু, তাহাদের অধিকাংশের বাড়ীতেই সতত গীত বাদ্য এবং কামোত্তেজক বিবিধ আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। মহাত্মা সাদী বলিয়াছেন—

"বযোব সংদেল কায় কুনাদ মেঃ দা, তাং।
চুঁ বিনাদ কেসাঁব্বর শেকাম বস্তাহ্ সং॥"
অর্থাৎ- উদর পুরিয়া খায় পাষন্ড বিহনে—
কেবা আর? দেখিলে ও ক্ষুধাতুর জনে.

আবার বছরে বছরে ঐ যে, রাস খেলায় রাস, বারোয়ারীর সময় বাজার হয়, যুবতী রূপসী দল নইলে বাজার জমবে না, তাই বাবুরা নানান জায়গার বাছা কাঁচা নাগরীগণকে এনে বাজারে কুঁড়ে বানিয়ে দেন; যখন সেই সকল রসাল রূপসীরা রসের পসরা খোলে, আর লাল গোলাপী নিশান তোলে, তখন বোধ হয় আমাদের ৩৩ কোটি দেবতা এসে তাদের সর্ব অঙ্গেই ঝোলে! আমরা কখনো ছাদে দাঁড়িয়ে, কখনো বাজারে বেড়িয়ে তা সকল দেখি, আর মনে মনে কতই কি শিখি। ঠাকুর খোলার ধ্যান, রূপসী টোলার দান, দেব দেবীদের গান শুনতে দেখতে যে জ্ঞানটা পাওয়া যায়, তাতে রাত না হতেই বাবুদের সাথে আমার কত সঙ্গিনী রঙ্গিণীরা আকাশের চাঁদটা হাত বাড়ায়ে পায়! সে পোড়া দান ধ্যান দেখলে ও শিখলে আমার না আরও জ্বলন্ত নরকে ঝাঁপ দিতে হয়! লো দিদি! এখন বোঝ দেখি। রাঁড়গুলাকে যা কখন সোদরে খেতে বা ছুঁতে দিবে না, নির্দয় হিন্দুর বাড়ী বার মাস তারই দুলন ঝুলন কি না?

বারোয়ারীর ধর্ম শুধু রসের বাহার মারা।
ধর্মের ছুঁতো ধ'রে কেবল রাঁড়ের কর্ম সারা।[১]

হা দিদি! পোড়া পরাণের আগুনটা ঠাণ্ডা করতে যে কতই কি করি, তা কিছুতেই কিছু হয় না! কোনও যোগযাত্রা, দেব দর্শন বা গঙ্গাস্নানের নাম শুনলে তো আর প্রাণটা ঘরে দাঁড়ায় না; তাই পাড়ার দিদি মাসী খুড়ী পিসীদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি দৌড়ি। আঃ—কপাল! তাও দেখি শুধুই ঠেলাঠেলি, ডলামলি, হুড়োহুড়ি, গড়াগড়ি, দেখাদেখি, চোখাচোখি সার! আবার তার মধ্যে কত শত রাবণ এসেও জোটে, দশ বিশ গণ্ডা সীতা হরণও ঘটে, তখন ফিরে আসাই ভার! দেব ঘরে হাজার হাজার নমস্কার, গঙ্গায় লক্ষ লক্ষ ডুব দিলেও দেখি সে আগুন যেমন তেমনই থাকে, কেবল পথে কি কি দেখে আসি, প্রাণটার মধ্যে তাই জ্বালা পোড়া করে!

---

১. হিন্দুর কোন একটি অনুষ্ঠানই প্রায় তামাশাশূন্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দোল, বারোয়ারী ইত্যাদির আমোদ উপলক্ষে বহুতর হিন্দুর বাটীর নিকটেই বার বিলাসিনীরা পিশাচ-বৃত্তি সমাধা করিয়া থাকে; অনেক স্থলের লোকেরা তাহাদের জন্য সারি সারি কুটির নির্মাণ করিয়াও দেন। তখন যুবতী বিধবাগণের মনে কিছু উদয় হয় নাকি?

ষষ্ঠ বিলাপ

কোন যোগে হায়! ফল নাই লো!
কোন সাধনায় বল নাই লো!
নিভাতে আমার,
মনের অঙ্গার,
ভবে বুঝি আর জল নাই লো!
মোর তরে আর জল নাই লো!!
শয়নে স্বপনে,
মরি সে তপনে,
তাহা নিবারণে (কোন) ঢল নাই লো!
কোন যোগে আর ফল নাই লো!![১]

বিধবা বিবাহ

সরলা! আহ্! থাক লো তরঙ্গিণী! আমি আর তোর মনের আগুনটা ফুঁ দে জ্বালাতে চাই নে; কেবল একটা কথা বল, তাই শুনে যাই। ঐ যে কোন্ ব্রাহ্ম বাবুটা এসে বিধবা বিয়ের কথার তর্ক করেন, তোর বাপ খুড়োরা তার দোষটা কি ধরেন? তুই তো বেশ লেখাপড়া জানিস, ভারত পুরাণ পড়িস, কথার দোষ গুণটা বোধ করি বুঝিস।

তরঙ্গিণী—আমার বাপ খুড়োরা যেসবে ছাই ভস্ম কয়, দয়াল বাবুটা তাঁর দাঁত ভাঙ্গা—উত্তর দিয়া থাকেন; কিন্তু যে অধম জাতির দিগ্বিদিক, উত্তর দক্ষিণ জ্ঞান নাই, তাদের উত্তরে কি হবে? কব কি যে নারী, নইলে কথায় কথায় উত্তর দিয়ে নুড়ো খুড়োদের নড়বড়ে দাঁতগুলো আমিই গুঁড়ো করতে পারি। খুড়োরা আগে ভাগে কতটা "ভটনং ফটনং" পড়ে বলতে লাগেন যে, আমাদের প্রধান শাস্ত্র মনু সংহিতায় বিধবা বিয়ের নিষেধ। তাই শুনে ঠাকুররা মাথা চুলকাতে চুলকাতে

১. হিন্দুদিগের কোনও যোগ-যাত্রা বা দেব দর্শনের সময় হিন্দু রমণীদের কাণ্ড কারখানা সকলেই জানেন। এ বিষয়ে বিধবা বিবাহের ঘোর বিদ্বেষী একজন হিন্দু মহাশয়ও কোন পত্রিকায় মনুর বচন উদ্ধৃত করতঃ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। যোগযাত্রায় বহুতর যুবতী স্ত্রীলোকও অপহৃত হইয়া থাকে, ইহার শত সহস্র প্রমাণ বিদ্যমান!

বলেন–হ্যাঁ, দেবর বা পর পুরুষ দিয়ে বিধবার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করা একেলে নয়, সেকেলে নিয়ম ছিল। এই কথা শুনে ব্রাহ্ম বাবুটা বলেন, মহাশয়! মনু যে কালের বিধবাগণকে অন্য পুরুষ দিয়ে সন্তান উৎপন্ন করতে বলেছেন, যদি সেই কালের বিধবাদের বিয়েও নিষেধ করে থাকেন, তাহাতে ক্ষতি কি? ফাঁক সরাই তো নাকের কাজ, নয় খাঁদাই হল। যদি মনুর কথামত পর পুরুষের দ্বারা বিধবা গর্ভে সন্তানোৎপাদন করা এ কালে দোষ হয়, তবে তাহার কথামত বিধবাদের বিয়ে না দেওয়াও দোষ। মনু তো গর্ভপাতকে মহাপাপ বলে কত ভয় দেখায়ে গেছেন, হিন্দুর ঘরে ঘরেই যখন গর্ভপাতের ছড়াছড়ি হয়, তখন মনুর বচন কোথায় রয়?[১]

তার পরে পুণ্যবান বাবুটা একেবারে ঝড়ের মত কতকগুলো শাস্তর পড়ে দেখায়ে দেন যে, হিন্দু ধর্মের হর্তাকর্তা যে ব্যাস দেব, সেই ব্যাসের জন্মদাতা ও কলি-ধর্মের নির্ণয়কর্তা পরাশর মুনি স্পষ্টভাবে এ কালের বিধবাগণের বিয়ে দিতে বলেছেন।[২]

তখন ঠাকুর দল হাঁটুর মধ্যে মাথা খুসতে খুসতে বলতে থাকেন যে, "হাঁ, শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু সে অক্ষতা যোনি বিধবার বিয়ের কথা, সকলের কথা নহে।"[৩] আছে, তখন দয়াল বাবুটাও ঝপাঝপ কতকটা বচন শুনায়ে বলেন

---

১. "পষাণ্ড মাশ্রিতানাঞ্চচরন্তী নাঞ্চকা মতঃ।

গর্ভ ভর্তৃদ্রুহা বৈষ্ণব সুরাপীণাঞ্চ যোষিতাম॥" (মনু ৫-৯০ শ্লোক)

অর্থাৎ যেসকল স্ত্রীলোক বেদ বহির্ভূত পাষণ্ডগণের আশ্রিত, যাহারা ইচ্ছাধীন অনেক পুরুষগামিনী, "যাহারা গর্ভপাতকারিণী' ও পতিঘাতিনী —যাহারা মদ্য পান করে, তাহাদের ঔদ্ধর্দেহিক ক্রিয়া (অন্ত্যেষ্টি সৎকার) নাই।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ

"ভারবর্ষ (বিধবাদিগের দ্বারা) ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণ হত্যার দোষের পাপের স্রোতে উচ্ছ্বসিত হইয়া যাইতেছে।" (বিধবা বিবাহ পুস্তক পৃঃ ১৮৬)

২. "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎ সুনরীণাং পতিরণ্যে বিধিয়তে॥

অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিব্যহ হওয়া শাস্ত্র বিহিত। (পরাশয় সংহিতা, অধ্যায় ৪)

৩. "পানিগ্রাহে মৃতে বালা কেবল ঃ মন্ত্র সংস্কৃতা।

সাচেদক্ষতো যোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥"

অর্থাৎ-পতির মৃত্যু হইলে অক্ষতা যোনি বিধবার পুনরায় বিবাহ সংস্কার হইতে পারে।

(বলিষ্ঠ সংহিতা ঃ ১৭শ অধ্যায় ও ১৫শ অধ্যায়; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১-৬৭)

যে, মনু কখনও বিধবা বিয়ে নিষেধ করেন নাই, মনুর ঐ বচন কদাচ বিধবা বিয়ে নিষেধক নহে।[১]

তিনি আরও বলেন, যদি মনুর বচনকে নিষেধক বলেও ধরা যায়, তাহলে মন তো বিধাগণকে দেবর বা পরপুরুষ দিয়ে সন্তান বানাতেও বার বার বলেছেন, তাও করান না কেন?[২]

---

১. বিধবা বিবাহ বিদ্বেষীগণ মনু সংহিতার ৯ অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। কিন্তু চিরস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ করিয়া দেখাইয়াছেন, উহাতে বিধবা বিবাহ নিষেধ বুঝায় না। বচনটি এই–

"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ততে কচিত।

ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদং পুনঃ॥"

বিদ্বেষীদের অর্থ–বিবাহের মন্ত্র সকলের মধ্যে এমন প্রকাশ নাই যে, একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে এবং বিবাহ শাস্ত্রে এমন বিধি নাই যে, "বিধবাগণের পুনর্বার বিবাহ হইতে পারে।"

বিদ্যাসাগরের অর্থ এই–"বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই। বিবাহ বিধিস্থলে বিধবার ক্ষেত্রজ (অপর পুরুষ দ্বারা) পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণও উক্ত নাই।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুতর যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিপক্ষদিগের অনুবাদের ভ্রম দর্শাইয়া আপন কৃত অর্থকেই সপ্রমাণ করিয়াছেন। (দেখুন–বিধবা বিবাহ পুস্তক–পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬২-৬৬।)

২. "দেবরাদ্বা সপিণ্ডদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ নিযুক্তয়া।

প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে।" (মনু ৯-৫৯)

অর্থাৎ নিজের স্বামী দ্বারা সন্তান উৎপন্ন না হইলে স্ত্রী সম্যক নিযুক্ত হইয়া আপন দেবর কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি হইতে পুত্র লাভ করিবে। পুনশ্চ ঃ

"ধনঃ যো বির্ভৃয়াদ ভ্রাতর্মৃতস্য স্ত্রী মেবচ।

সোহপত্যং ভ্রাতুরুৎপাদ্য দদ্যাৎ তস্যৈব তদ্ধনম!" (মনু—৯-১৪৬)।

অর্থাৎ—কোন ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় মরিলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সেই) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়াতে পুত্রোৎপাদনপূর্বক তাহার (মৃতের) সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে দিবে। মনু আপন সংহিতার অনেক স্থলে বিধবাকে অন্য পুরুষের সহবাস দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে আদেশ দিয়াছেন। (দেখুন—অধ্যায় ৯ অধ্যায়, শ্লোক ৬০-৯ অধ্যায় শ্লোক ৬১) ৯। ৭০ শ্লোক। ৯-১২০ শ্লোক)

আপন গোত্রের কোনও পুরুষ হইতে বিধবাগণ পুত্রোৎপাদন করিতে পারে। (মনু সংহিতা—অধ্যায় ৯, শ্লোক ১৯০)

মনু যদিও একবার বিধবার বিবাহ নিষেধ করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষের সঙ্গে তাহাদিগকে সহবাস করিতে অনেক বার বলিয়াছেন।

তখন ব্রাহ্ম বাবুটা একেবারে একটা লম্বা শাস্ত্র শুনায়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, "শাস্ত্রে কি পুত্রবতী, কি পুত্রহীন কি ব্রাহ্মণী, কি শূদ্রাণী, সকল শ্রেণীর বিধবাদের বিয়ের কথাই ত আছে।[১]

সরলা।—লো তরঙ্গিণী! ঐ তোর বাপ খুড়োরা বলেন যে, "অক্ষতা যোনি বিধবার বিয়ে শাস্ত্রে আছে।" ভাল, সে "অক্ষতা বিধবা কারা? "আর সব কথা বুঝতেছি, কেবল ঐটা তো বুঝলেম না।

তরঙ্গিণী।—(মুচকে হেসে) আবার এ পোড়া মুখটায় তোর কথাটা শুনে হাসিটাও এল। যদি বুঝে না থাকিস তো বোঝ। ঐ মাসিক ফুল না ফুটতে, যৌবনের ঢেউ না উঠতে, স্বামীর গায় গা না খাটতে, আর কবই বা কি? যা ক'রে তোরা নীতাপে থাকিস ও বাচ্চার বর মাগিস, সেই কাল না জুটতেই যে পোড়া কপালীরা বিধবা হয়, তারাই তা, আর কারে দেখাব? অভাগিনীই সেই বয়সে রাঁড়!

সরলা!—(বিস্মিত বদনে) হ্যাঁ লো, সে কি? তোর বাপ খুড়োরাই যখন বলে যে, "অক্ষতা বিধবার বিয়ে আছে," তখন তোর বিয়েটা দ্যায় না কেন?

তরঙ্গিণী।—হা দিদি"! সে দয়াল বাবুটা তাও বলতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আমি ওসব আড়ে অন্তরে দাঁড়ায়ে শুনি, ঠাকুরের পাল তাইতে গাল বাঁকিয়ে আস্তে আস্তে বলেন, আমাদের দেব দেবীদের মধ্যে প্রায় বিধবা বিয়েটা দেখা যায় না; আবার যে দেশের যে আচার ও যে কালের যে নিয়ম, তাহাও ধর্ম। দেশাচার, কালাচার ছাড়িলেও তো ধর্ম থাকে না, তাই আমরা "অক্ষতার বিয়েও দেই না।"[২]

---

১. "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীব চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎ সুনারীণাং পতিরণ্যে বিধিয়তে॥
অষ্টৌ বার্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম।
অপ্রসূতাতু চত্বারি পরিতোহন্যং সমাশ্রয়েত॥"
(নারদ সংহিতা—দ্বাদশ বিবাদ পদ)
অর্থাৎ "স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্যার বিবাহ শাস্ত্র বিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণী ৮ বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না থাকে, ৪ বৎসর পরে বিবাহ করিবেক।" উক্ত বচনের শেষাংশে অন্যান্য জাতীয়া বিধবা স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের কথাও আছে।

২. বিধবা বিবাহের বিপক্ষগণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রীয় তর্কে পরাস্ত হইয়া শেষে এই মাত্র আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, "বিধবা বিয়ে দেশাচার বিরুদ্ধ।" কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত আপত্তিরও অসংখ্য উত্তর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন যে, দেশাচারের ভান করিয়া বিধবাদিগের বিবাহ না দেওয়া সম্পূর্ণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। পরবর্তী নোট দেখুন।

এই মত কত কি মাথা মুণ্ড বকতে বকতে ঠাকুররা মেকুর হয়ে বসেন আর খুশি খুশিয়ে কাশেন।

"রয় না আচার ধর্ম বিচার পুরুষদিগের কালে!

দেশাচারে আগুন ধরে, রাঁড়ের বিয়ে হোলে।।"

ঠাকুরদের কথার উত্তরে বাবুটাও শাস্ত্র পড়ে দেখান যে, "যে কাজে শাস্ত্রে বিধি পাওয়া যায়, সে কাজে দেশাচার অগ্রাহ্য। শাস্ত্রে বিধবা বিয়ের শত শত প্রমাণ থাকিতে, দেশাচার দেশাচার করে তাদিগে জ্বালায়ে মারা কেবল বোকামি ভিন্ন আর কিছুই না।"[১]

সরলা—সত্যি লো, আমাদের বাড়ীতেও একদিন ঐ কথার তর্ক হচ্ছিল, তাই আমার স্বামীকে বলতে শুনলেম যে "হাঁ বিধবার বিয়েটা হওয়া এক রকম মন্দ না, তাহলে অনেকটা জীবন রক্ষা হয় বটে; কিন্তু দেশাচারটা থাকে না, আবার দেব দেবীদেরও বড় ওটা ছিল না। বিধবাদের পক্ষে সবচেয়ে শরত সুন্দরী ও গিলিবালার মত ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকাই ভাল।"

তরঙ্গিণী। তাই তো কই লো, পোড়া রাঁড়ীদের চোখে সবেই ধুলা দিতে চায়! ভাল, গোরুগুলাও তো আমাদের দেব দেবী; তাদের মধ্যে কবে কার নিকে বিয়ে দেখেছিস? বাবুরা দেখি গাভীগুলাকে মা, ষাঁড়গুলাকে বাবা জেনে পূজা করেন। আবার কল্যাণে আমিও ভারত পুরাণ পড়েছি। মহাভারতে আছে, হিন্দুর সমুদয় বেদ পুরাণের হর্তাকর্তা ব্যাস দেবের ছোট ভাই বিচিত্রীবীর্য, দুইটা ভরা যুবতী বৌ থুয়ে ম'রে ছিল; অমনি ব্যাস ঠাকুর বংশ রক্ষার উসিলাতে সেই ছোট ভাই বৌ দুটার সঙ্গে রঙ্গ-লীলা করে ছেলেপিলে জন্মায়ে ছিলেন, তারি এক ছেলে নাকি আমাদের পাণ্ডু রাজা! ভারত পুরাণে আরও পড়েছি বড় বড় দেবীগুলো

---

১. বশিষ্ট কহিয়াছেন—

"লোকে প্রেত্য বা বিহিতোধর্মঃ।

তদলাভে শিষ্টাচরঃ প্রমাণম।"

অর্থাৎ লৌকিক কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্র বিহিত ধর্ম অবলম্বনীয়; শাস্ত্রীয় বিধান না পাইলে, দেশাচার প্রমাণ।

পুনশ্চ–

"স্মৃতির্ব্বেদ বিরোধেতু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।

তথৈব লৌকিকং বাকং স্মৃতিবাদের পরিত্যজেৎ॥

অর্থাৎ "বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির সহিত বিরোধ ঘটিলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হয়।" প্রয়োগ পারিজাত ধৃত স্মৃতি ও স্কন্ধ পুরাণ। বিধবা বিবাহ বেদ ও স্মৃতিসম্মত।

একি সময় ৪/৫ টা ক'রে জল যোগানে দেব্‌তা ছিল, বাবুরা দেখি তাহার পূজার জন্য বছরে হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ করেন। আমি ভারতে আরো পড়েছি, পূর্বে ঋষি মুনিদের সময় নারীগণ যার সাথে ইচ্ছা তারি সঙ্গে রঙ্গলীলা করতেন; তাতে আরো হিন্দু নারীদের ধর্ম হত, বরং ঋষি মুনিদের তাই পরম ধর্ম ছিল। এখন বল দেখি, যাদের ঠিকেতে দোষ নেই তাদের নিকেই বা কি, আর বিয়েই বা কি?[১]

ঠাকুরেরা যদি আমাদের সেই দেবীদের মত ধর্ম করতে দেন, তাহলে তো ফিরে বিয়ের কথা স্বপ্নেও মনে করিনে! আমাদের যে বাবুরা দেব দেবীদের ধর্ম ঢাক মাথায় লয়ে বিড়িলাফ মারেন, তাদের বিধবা কন্যা ভগ্নীরা যেই সেই ধর্ম পালন করে, উদরটা একটু ফাঁপায়, আর তখনি দেখি জোলাপ দিয়ে সাফ করেন!

যা করে দেবীরা হয়ে গেছে পুণ্যবতী।

তা করে রাঁড়ীরা কেন হইবে অসতী?

রাঁড়গুলাকে ঠাকুররা মাছ মাংস ছেড়ে কেবল এক বেলা দুটো আলো অন্ন খেয়ে এবং কাদায় লিঙ্গ পূজেই শরৎ সুন্দরী ও গিরিবালার মত ব্রহ্মচারিণী হতে উপদেশ দেন।

---

১. পাণ্ডু রাজা স্বীয় সহধর্মিণী কুন্তীকে উপপতি দ্বারা সন্তান উৎপাদনার্থে অনুরোধ করিয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা ঃ—

অনাবৃতা ঃ কিলপুরা স্ত্রিয় আসন বরাননে।
কামচার বিহারিণা ঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনী॥
তাসাং ব্যুচ্চ রমাণনাং কৌমারাৎ সুভগে পতিন।
নামধর্ম্মোহ ভুদ্বরারোহে সহি ধর্মঃ পুরাভবৎ॥
প্রমাণ দৃষ্টো ধর্ম হয়ং পূজ্যতেচ পূজ্যতেচ মহর্ষিভি।
উত্তরেষু চরম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে॥
স্ত্রীনামনুগ্রহকারঃ সহিধর্ম সনাতনঃ।

(মূল–সংস্কৃত মহাভারত, অধ্যায় ১২২)

অর্থাৎ "হে সুমুখী, চারুহাসিনী! (কুন্তী!) পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন, অরুদ্ধা, স্বচ্ছন্দ বিহারিণী ছিল। পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হইলে তাহাদের পাপ হইত না। পূর্বকালে ইহা ধর্ম ছিল। ইহা প্রামাণিক ধর্ম; ঋষিরা এই ধর্ম মান্য করিয়া থাকেন। উত্তর কুরুদেশে অদ্যাবধি এই ধর্ম মান্য ও প্রচলিত আছে। এই ধর্ম সনাতন ধর্ম, স্ত্রীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল।" (বিদ্যাসাগরের অনুবাদ।)

কিন্তু দিদি! বল দেখি, সেই বাবু ঠাকুরদের মধ্যে কয়জনকে ব্রহ্মচারী পুরুষ দেখেছিস? তারা না বলতে ঘোড়া, চলতে খোঁড়া! ঐ যে বেটারা সমস্ত গায় গোদানী কেটে, কোপনী এঁনে চিমটা ধরে, গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী বা মহান্ত সেজে বেড়ায়, কেহ বা ধর্ম প্রচারের ভানে বক্তৃতা ও গলাবাজি করে সসাগরা সংসারটা নাড়ায়, তাদেরও যে ব্রহ্ম ও ধর্ম-জ্ঞান তাও শৈলবালা, তারকেশ্বর ও সীতাকুণ্ডের মহান্তগণ আর কাশীবাসী মহাযোগী কৃষ্ণানন্দ স্বামী হতেই ভাল জানি।[১] যে বাবুরা বিধবা বিয়ের কথায় তেলে বেগুনে জ্বলেন ও তাদিগে শূন্য ঘরে শুয়েই সতী হতে বলেন, আমি তাদের অনেক জনকে চিনি! আমি কখনও কখন চেক্‌রে দাদাদের বাসা কুঠিতে শহরে যেয়ে দেখেছি, সেই বাসা কুঠির আশপাশেই কত নব নাগরীদিগের কারখানা! আমরা সারাটা রাত সেখানে শুয়ে সেই ভুবন মোহিনী ও কোকিল কণ্ঠিনীদের গলায় গলা মিশায়ে কত বাবুদিগকে রঙ্গ রসের গান গাইতে শুনি, গলার সুরেও কতকটা জান্‌তে পাই যে, এই ইনি, ঐ উনি। আবার যখন সকালে বিকালে আমরা কুঠির ছাদে বা দোতালায় দাঁড়ায়ে তার আশপাশে তাকাই, তখন যে সব রসরঙ্গ দেখতে পাই, তা কি আর মুখে বল্লে ফুরায়? আরো কবে কোন্ বাবুটার গিন্নী অসুস্থ হবে কি কোথায় যাবে, সেই ভয়ে আগে ভাগেই বাসায় দু একটি করে পরাণ ভরা জি বা রাঁড়ের যোগাড় রাখেন! যাদের এই রীতি, সেই বাবুরা আমাদের বিয়ের কথায় গাল বাঁকালে কি গায় সয়?

বাইরে ঘরে, রাঁড়ের তরেই আমোদ বাবু দলে।
হবে কি আর, অমন বাহার, মোদের বিয়ে হলে?[২]

১. চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড ও হুগলী-তারকেশ্বরের মহান্তদ্বয়ের লীলাকাণ্ড দেশ বিদিত।

২. ফরিদপুর---ভাঙ্গার অন্তর্গত মালীগ্রাম নিবাসী পূর্ণানন্দ গোস্বামী মহাশয় একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। ইনি কলিকাতাস্থ ভবানীপুর ও চীৎপুর অঞ্চলে থাকিয়া কতিপয় খ্রীষ্টিয়ানকে যোগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পরমানন্দ দাস নামক একব্যক্তি শৈলবালা নাম্নী পঞ্চদশ বর্ষীয়া একটি অনূঢ়া কন্যাকে তাহার নিকট যোগ শিখিতে দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী পরমানন্দের সেই পরমা সুন্দরী শৈলকে লইয়া যোগাকর্ষণে আসিয়া যশোহরস্থ (জজ-প্লীডার) রামোত্তম বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং (প্রকাশ যে), রামোত্তম বাবুকেও যোগমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। খুঁজে খুঁজে পরমানন্দ যশোহরে শৈলের খোঁজ পাইয়া সন্ন্যাসীর নামে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে শৈল হরণের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। (১৩০৩) অগ্রহায়ণ মাসে যশোহরের গিরিশ বাবু ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমার বিচার হয়, কিন্তু "দায়ী মুদ্দায়ী রাজি, কি করিবে কাজী।" শৈল শিক্ষিতা—ইংরেজী ও বাঙ্গালা বেশ জানেন; শুনিলাম তাহারই বক্তৃতাবলে প্রেমিক সন্ন্যাসী মুক্তি পাইয়াছিলেন। শৈলের জবানবন্দীতে সন্ন্যাসীর অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইয়াছিল।

দেশাচার ধর্ম

বাবুরা কেবল দেশাচার দেশাচার করেই আকাশ পাতাল ফাটান, আর পাক করা মাছগুলাকে পাতে হাঁটান। লো দিদি! বল দেখি, বাড়ীতে রাঁড়ী পুষে, বিনি টাকায় চাকর চৌকিদার রাখা, মাসে মাসে জোলাপ দে তাদের পেট সাফ করা,

---

কাশীধামের কৃষ্ণানন্দ স্বামী (ওরফে সুবক্তা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন) মহাশয় ভারত বিখ্যাত হিন্দু ধর্ম প্রচারক ও পরিব্রাজক ছিলেন; তাঁহার ন্যায় তেজস্বী হিন্দু ধর্ম বক্তা ভারতে কমই দেখা গিয়াছে। তিনি বেদ বিদ্যালয় স্থাপন ও বহুতর ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি প্রকাশ এবং বক্তৃতা করিয়া, বাস্তবিক ভারতে হিন্দু ধর্মকে নব জীবন প্রদান করিয়াছেন। শেষে তিনি হিন্দুর পুণ্যময় কাশীধামে একটি যোগাশ্রম স্থাপন করিয়া স্বয়ং মস্তক, শ্মশ্রু, গুম্ফ মুণ্ডিত গেরুয়া বস্ত্রধারী মহাযোগী ও (বৈদ্য হইলেও ব্রাহ্মণাদি সর্ব জাতি) হিন্দু স্ত্রী পুরুষের যোগ শিক্ষাদাতা হইয়াছিলেন। ক্ষান্তকালী নাম্নী ১২ বৎসর বয়স্কা একটি অনূঢ়া কন্যাও তাঁহার নিকট যোগমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। ক্ষান্ত অতীব সুন্দরী, যৌবনের অনন্ত কান্তি ও অপূর্ব আভা তাহার সর্বাঙ্গে বিভাসিত; পৌর্ণমাসী চন্দ্রিকাবৎ মুখশ্রী বিকশিত, কুচযুগল কেবল বকুলাকারে মকুলিত, সুদীর্ঘ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আলুলায়িত কুন্তলদামে পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত; তাহাতে আবার নবীনা যোগিনী! বিগত (১৩০৩) ১৬ই ফাল্গুন দিবাগত রাত্রি ৯/১০টার সময় ক্ষান্ত স্বীয় গুরু কৃষ্ণানন্দ স্বামীর যোগাশ্রমে আরতে (নিবৃত্তি বা যোগবিশেষ) দেখিতে যান। আরতি শেষ হইলে স্বামীদেব ক্ষান্তকে যোগাশ্রমের উপর তালায় লইয়া গিয়া বলাৎকার করেন। ক্ষান্তের মাতা (শিক্ষিতা বিধবা?) সৌদামিনী দেবী তাহা অবগত হইয়া রাত্রি ১১টার সময় পুলিসের সাহায্যে গিয়া ক্ষান্তকে স্বামীর কবল হইতে উদ্ধার করিলেন। ঐ রাত্রিতেই ক্ষান্তের ডাক্তারী পরীক্ষা হইল এবং পর দিবস আদালতের আশ্রয় লইলেন। দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কাশীর সেশন জজের বিচারে স্বামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর কারাবাস! এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল হয়। তাহাতেও জজের রায় বহাল! ক্ষান্তের মাতা সৌদামিনী দেবী বিধবা, ভদ্র ঘরের মেয়ে, লেখাপড়া জানা, এই মোকদ্দমায় তাহারও অনেক গুপ্ত লীলা ও প্রেমপত্র বাহির হয়। কাশীবাসী হিন্দু যোগী যোগিনীদিগের অনন্ত মহিমায় অনেক শিক্ষা আছে। খুব সম্ভব যে, কৃষ্ণানন্দের ঐরূপ লীলাবৃত্তি অভ্যস্ত একটু বেশী বয়সের সধবা কি বিধবা হইলে বোধ হয় উচ্চবাচ্য হইত না; ক্ষান্ত কখনও পুরুষের হাতে ঠেকেছিল না, তাই বুঝি ক্ষান্ত ক্ষান্ত হওয়াটাও শিখেছিল না! কাশীর জজ বাহাদুর কৃষ্ণানন্দের যোগমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার যে গুপ্ত লীলাগৃহ (অন্ধকার পাতালপুরী বিশেষ) দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীয় জুরিগণ অবাক ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। মহাযোগী কৃষ্ণানন্দ ঐ যোগমন্দিরে কত হিন্দু বালিকা ও যুবতীর সর্বনাশ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হওয়া দায়। কৃষ্ণানন্দ কাম-যজ্ঞ সম্পাদনার্থে ঐ নিভৃত গুপ্ত প্রকোষ্ঠ সকল অতি সুকৌশলে নির্মাণ করিয়াছিলেন। গুপ্ত কুঠরীগুলি যেন ঐন্দ্রজালির গুপ্ত নিকেতন!! ক্ষান্তকালীর সহিত একই দিন আর একটা বালিকাকে অন্ধকার গৃহে স্বামীজী গুপ্ত মন্ত্র দিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল স্বামীজী ভবযন্ত্রণা এড়াইয়াছেন।

সদ্য শিশুগুলাকে হাঁড়ী পুরে ফ্যালা, এই সকল কি হিন্দুর দেশাচার ও কালাচার ধর্ম?[১]

ঐ যে কত শত রাঁড়ী আর জোলাপের ঝাল সৈতে না পেরে শেষ কৃষ্ণ প্রেমের নিশান তুলেছে ও কেউ বাজারে গিয়ে সরাই খুলেছে, সেই নাকি আমাদের দেশাচার ধর্ম?[২]

বাড়ীতে রাঁড়ী রেখে গুরু-শিষ্যে, পিতা-পুত্রে, একত্রে উপকার লওয়ায় নাকি এই দেব সমাজের দেশাচার ধর্ম?[৩]

একটার সাথে রাঁড়ের বিয়ে হলে দেশাচার নষ্ট হয়, কিন্তু ঘরে বাইরে হাজারটার সাথে মজা উড়ালে তা কি পুষ্ট হয়?

তাও যা'ক বল্ তো দিদি! আমাদের কোন্ দেবতার বাবার কালে পেঁয়াজ, মুরগী, পোলাও, কোর্মা, কালিয়া, কাবাব, ফির্নি, শিরনি, কোপ্তা, জেলী, হালুয়া, পুডিং এই সব সাইবী ও মুসলমানী খানার নাম শুনলো ও খেয়েলো? এখন দেখি মসলা, পাখী ও সুখাদ্যের নামে সব হিন্দুর হাঁড়িতে, নাড়িতে দাড়িতে ও বাড়ীতে জড়িয়ে গেল। আবার কোন্ দেবতা কোন্ জন্মে ইংরেজী বুলি শুনেছিলো? এখন দেখি হাটে, ঘাটে, মাটে, খাটে, শুতে, খেতে, নিতে, দিতে, উঠ্তে বসতে, হাসতে-কাশতে বাবু ও বাবুনীদিগের মুখে সদাই "কাম হিয়ার, মাই ডিয়ার, গড্ গুড্ ভ্যাড্ ভুড্ ফ্যাটফুট, সার ফার" আরো কত কি শুনি, তবু তো হিন্দুর দেশাচার ধর্মের মর্মে বজ্রাঘাত হল না।

যাহাদের পুরবাসিনীগণের বাস-কামরা হইতে বারাঙ্গনা পিশাচিনীদিগের অস্বাভাবিক রঙ্গ রহস্য ও পাপ কাণ্ডসমূহ প্রতি মুহূর্তে জ্ঞাত হওয়া যায়, এমন বহুতর ভদ্রলোকের দ্বিতল ত্রিতল ইমারত শহরে বাজারে বর্তমান। অনেক বাসার সংলগ্ন বেশ্যাদিগের পাপালয় দৃষ্ট হয়। 'ঝি' নামে যেসকল বিধবা বাসায় বাসায় থাকে, তাহাদের অনেকের বেশবিন্যাস, রঙ্গলীলা ও অঙ্গভঙ্গির নিকটে প্রকাশ্যে বারনারীরাও পরাস্ত।

১. হিন্দু সমাজে গর্ভপাত ও ব্যভিচার পাপের কত দূর প্রাদুর্ভাব, তাহা জনৈক হিন্দু লিখিত "বজ্রবিলাস" নামক পুস্তকের ৪২ ও ৪৬ পৃষ্ঠা এবং পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিত "বিধবা বিবাহ" পুস্তকের (৫ম সংস্করণ) ১৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

২. আমরা অনেকগুলি ভদ্রাভদ্র হিন্দু বিধবার তালিকা দিতে পারি, যাহারা গর্ভধারিণী হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ বা বৈষ্ণবী হইয়াছে। প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন, সকলেই জানেন।

৩. ১৩০৩ সালের ১৪ই বৈশাখের "সুধাকর" পত্রিকায় "মানুষ বটে পশুর স্বভাব" শীর্ষক একটি সংবাদ ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছে (বরিশাল) পটুয়াখালী থানার অন্তর্গত কোন গ্রামে এক আচার্য্য ঠাকুর একটি বিধবার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বিধবাকে বাটীতে রাখেন; শেষে ঠাকুরের পুত্র দুর্গাপ্রসন্ন দ্বারা বিধবা গর্ভিণী হয়। তাহারা থানায় এইরূপ জবানবন্দী দেন।

একটু গুড্ গড্ করতে শিখলেই দেখি আর বাবুরা আপন নামটাও দেশের মত চলতে চান না; তখন হন কে, এম, ঘোষ, কে, সি, বোস; আর, সি, রায়; পি, এম, আচার্য্য; এস, এম, ভট্টচার্য্য; আরও কত কি! আবার দুই বাবুতে দেখা হলেই "গুড মর্নিং" না কি বলেই খানকিটা চিড়িং বিড়িং! এই বা কোন্ দেবতার দেশাচার?

আমাদের কোন্ দেবতার বাবার কালে কাটা কাপড় আঁটা জামা আর চামড়ার জুতো নজরে দেখেছেন? তাদের যে কাপড় পরুন ছিল, তা ঐ রাস খেলার দেবতা ঠাকুরদের কল্যাণে আমার জানতে বাকি নেই। মস্ত মস্ত দেব দেবীগুলা যে সকল ফুরফুরে শাড়ী ও ধুতি উড়ানী পরে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছেন, দেখেছি তার ভিতর দে আকাশ পাতাল, হদ্দমুদ্দ নজর পড়ে। সকলের বড়টা শিব তো ধোড়ার মত ভিড় গড়ায়ে হা-করা মার পার তলেই উলঙ্গ সটান! কৈ? বাবুরা সে সব দেশাচার পালেন কৈ? তাহারা দেখি ফুল না ফুটতেই সাহবী কোট, প্যান্টলুন, হ্যাট, কলার, শার্ট, বেনিয়ান, গেঞ্জিফ্রক, ওয়েষ্ট কোট, শিকারী ড্রেস, ব্রেচিত, ষ্টকিং, গ্যাটেস্, চেন্ ঘড়ি—এই মত কত কি পরেন, আর সায়েবী ফ্যাশানে চুল ছেঁটে, সিঁতে কেটে, পুরো দমে সায়েবী ভাব ধরেন; পোড়া দেশাচার তখন কার বাড়ী যায়? বাবুরা সময় সময় ঐ যে মুসলমান বেটাদের নাম শুনলেই তাদের নেড়ে, দেড়ে, তুর্ক, মূর্খ, যবন, ম্লেচ্ছ বলতে বলতে চুটকি ঘুরান, আবার দেখি উকিল, মোক্তার আমলা ও হাকিম বাবুরা তাদেরই ইজের-চাপকান, কুরতা-আচকান, পাগ্ড়ী চোগা পরে অবিকল মোল্লাজির সাজ ধরে কাছারি যান; যাদের নামে দোষ, কামে দোষ : যাদের যবন ও ম্লেচ্ছ বলে গালি দিয়ে ঠাকুররা বাতিক ভাঙ্গেন; ওঃ! তাদের পাকে পোষাকে, খাদ্যে, বাদ্যে, চলনে বলনে দোষ নাই? হা—রে দেশাচার! কেবল আমরাই তোর মা বাবা ও ভক্তের মাথা খাই?[১]

---

১. ইংরেজ (খ্রীষ্টান) ও মুসলমানদিগকে হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ বলিয়াই জানেন; সময় পাইলে তাহাদের প্রতি উক্ত শব্দ দ্বয় প্রয়োগ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেও ত্রুটি করেন না। "শব্দার্থ প্রকাশিকা" নামক অভিধানের ১ম সংস্করণে বাবু কেশবচন্দ্র রায় মহাশয় "যবন" অর্থে মুসলমানকেই লক্ষ্য করিয়া ম্লেচ্ছ অর্থ লিখিয়াছেন। ধন্য অর্থ জ্ঞান!! কাণ্ড জ্ঞানের ত কথাই নাই কিন্তু বিদ্বেষ জ্ঞানটা ষোলকলায় পরিপূর্ণ!!

এখনকার কত সাহেব-বাবুরা দেখি আর বাবুনীগুলাকেও দেশী পোষাক পরান না; তাদের ঠিক মেমের মত টাইট বডি ষ্টিক বডি, স্কট, ফ্রক, হাফ ও ফুল গাউন, হ্যাবিডস্কট, লেডী শার্ট, লেস, পলানেস কলার, ষ্টকিং, সুজ, প্যাটেস—আরো কত কেছেমের ফ্লদার টুপী পরায়ে মেম সাহেব সাজান; আর সায়েবী নামে সায়েবী কামে, সায়েবী ধামে, সায়েবী রঙ্গে, সায়েবী ঢঙ্গে, সায়েবের সঙ্গে, সায়েবী বলে, সায়েবী জলে, সায়েবী কলে, সায়েবী তালে, সায়েবী হলে নাচান, এই বা কোন্ দেবতার বাবার দেশাচার?

যে গো-হত্যার নামেই কত বাবুরা ঘৃণায় বিষ্ঠা বমি করেন বা রাগে অন্ধ হন; তারাই শুনি হালালী চামড়ার জুতা পায়ে পরেন; আঃ! যে গাই হিন্দুর মা, সেই মায়ের মাংসে ছায়ের পা?

আরও জানি, কত নবীন বাবুরা পাস করতে বিলাত যান; সেখানে যেয়ে সায়েবের সাথে, সায়েবের হাতে, সায়েবের পাতে, সায়েবী দানা ও সায়েবী খানা খান; শেষে দেশে এসেই যুক্তির য়্যাসিডে পেটের সমস্ত মোটা গোটা মাংসের অংশটা ধ্বংস ও হজম করে, সমাজের কর্তাগিরি পান। আবার শুনেছি, কত সাহেব-রঙ্গী বাবুরা নাকি কলিকাতার উইলসন গ্র্যাণ্ড হোটেলে সুমিষ্ট গোমাংসে ভুড়ি ভরেন ও রেল-ষ্টিমারে বসে নানা জাতির ছোঁয়া ও নেওয়া জলপান করেন; ফৌজদারী বালাখানার মোগলাই হোটেলগুলাও নাকি বাদ যায় না। তখনো পোড়া দেশাচার ধর্মের মর্মে আগুন লাগে না![১]

---

১. সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বিলাতের "কার্পেন্টার এসোসিয়েশনে" বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, "ভারতে যত বিলাত ফেরা হিন্দু সন্তান বিনা প্রায়শ্চিত্তে হিন্দু সমাজে চলিত হইয়াছেন। আবার অনেকে বিলাত না আসিয়াও সাহেবী চালে চলিতেছেন; পানাহারে এখন আর কড়াকড়ি নাই, অথচ সকলেই সুহিন্দু বলিয়া চলিতেছেন।"

(দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা—১৩০২, ৯ই ফাল্গুন, ৫ম কলাম)—আর প্রায়শ্চিত্ত করে আজকাল তিন যুগের পুরাতন খৃষ্টানও হিন্দু সমাজভুক্ত হতে পারে। রামবাগানের দত্ত পরিবারস্থ ডাক্তার বিলাত গিয়ে খ্রীষ্টান হয়ে মেম বিয়ে করেছিলেন; মেমের পেটে ২/৩টা ছেলেমেয়েও হইয়াছিল। আর হয়তো কত শত পাউণ্ড শূকর, গরু ও মুরগীর মাংস উদর পূর্ণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে হিন্দু ধর্মের কল্যাণে প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি খাঁটি হিন্দু হয়েছেন।

"ব্রজবিলাস" লেখক বিধবা বিবাহ-বিদ্বেষী পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "যে প্রসিদ্ধ পরিবারে গোমাংস পাক করিবার জন্য মুসলমান পাচক, আর শূকর মাংস পাক করিবার জন্য হাড়ি পাচক নিযুক্ত থাকে, সেই পরিবারের পুরোহিত কুলে দোষ স্পর্শ হইতে পারে কিনা? (ব্রজবিলাস—পৃঃ ৩৭)। বর্তমান হিন্দুদিগের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রমাণদ্বয়ই যথেষ্ট।

শাস্তরে শুনি, কন্যা বিক্রি আর গো-বধ সমান পাপ; কিন্তু কৈ? কোন ধর্মের পুত্রই তো সে কথার ধার ধারেন না। বরং যেই কারু একটি মেয়ে ভূঁইতে পড়ে, অমনিই সে সিন্দুক বাক্স গড়ে!! আবার তাই বিয়ের জন্য কত গুড়ো-বুড়ো, টাকার শাখাল বেন্ধে হুড়োহুড়ি দে লড়ে। হায়!

গোবধ সমান পাপে তাপ নাহি গায়।

বিধবার বিয়েতেই প্রাণ জ্বলে যায়?[১]

আরো শুনতে পাই—বেধ শাস্তর ও গায়ত্রী পড়া কেবল বামুনদেরই একচেটে ধর্ম; শূদ্রের সামনে বেদ ও গায়ত্রী ধর্মের কথা বলাও নাকি পাপ।[২] ও বামুনদের সঙ্গে এক বিছানে বসলেও পাপ হয়; কেবল বামুন সেবা ছাড়া তাদের ধর্মকর্মও নাকি শাস্তরে নাই।[৩] কিন্তু কৈ? এ সকল কথা ঠাকুরদের মুখেই শুনি,

---

১. "ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্যান, গৃহ্নীয়াচ্ছুক কম্বাপি।

"গৃহ্নন শুল্কং হি লোভেন স্যাপ্নরোহ পত্য বিক্রয়ী?" (মনু ৩-৫১)

অর্থাৎ—"ধন গ্রহণ দোষজ্ঞ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত অল্প মাত্র পণও গ্রহণ করিবেন না। কারণ, লোভবশতঃ শুল্ক (পণ) হইলে অপত্য (সন্তান) বিক্রয়ী হইতে হয়। গো-বধ ও সন্তান বিক্রয় উভয় সমান উপপাতক।"

আমরা ৭৫০, ১১০০ ও ১৬০০ টাকা পণ গ্রহণকারী বহুতর ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগকে দেখাইতে পারি। ২/৪ শত টাকা পণ দেওয়া হিন্দুর সংখ্যা তো প্রচুর!

একদল পণ্ডিত আজকাল হিন্দু সমাজ হইতে কন্যার পণ গ্রহণ প্রথা উঠাইবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন। আমরা বলি, মহাত্মাগণ! গাছের মূল কাটিয়া ফলের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। বিধবা বিবাহ হইলেই সব লেটা চুকিবে।

২ নাবিস্পষ্ট মধীয়ীত নশূদ্র জন সন্নিধৌ।

ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো পুনঃ স্বপেৎ॥ (মনু—৪-৯৯)

অর্থাৎ অস্পষ্টভাবে শূদ্র ও জনতা সমীপে এবং রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া বেদ পাঠ করিবে না এবং বেদ পাঠে পরিশ্রান্ত হইলে পুনর্বার আর শয়ন করিবে না।

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম।

ন চাস্যো পদিশন্ধর্ম্মীং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥ (মনু—৪-৮০)

অর্থাৎ, শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে উপদেশ, হুতশেষ বা ধর্ম উপদেশ প্রদান করিবে না। দাস ভিন্ন কাহাকেও উচ্ছিষ্ট, কিম্বা শূদ্রকে কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না।

যোহ্যস্য ধর্ম না চষ্টে ষ শৈবা দিশতি ব্রতম।

সো হসং বৃৎঃ নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥" (মনু-৪-৮১)

অর্থাৎ, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্ম উপদেশ বা ব্রতানুষ্ঠানে আদেশ প্রদান করেন, তিনি শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন।

৩ সহাস নভমি প্রেপসূরুৎ কৃষ্টস্যাপকৃষ্টজ ঃ।

কট্যাং কৃতাঙ্কোঃ নির্ব্বাস্যঃ স্কিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥

অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক স্থানে বসিলে, রাজা উহার কটিদেশ

লৌহময় তপ্ত এলাকায় অঙ্কিত করিবেন। (মনু ৮-২৮১)

বিপ্রাণাং বেদ বিদূষাং গৃহস্থাণাং যশোস্বিনাম।

শুশ্রূষৈবতু শূদ্রস্য ধর্মানৈঃ শ্রেয়সঃ পরঃ॥

কাজের সময় তো কিছুই না। তখন দেখি, দাস, ঘোষ, বোস, দত্ত, গুপ্ত, মিত্র, সোম, সিংহ, গুহ, হালদার, মজুমদার, সরকার, কামার, কুমার, বারুই, শঙ্কর এদের মুখেই বেদ বচনের ছড়াছড়ি, শূদ্রে বামুনে এক আসনেই গড়াগড়ি, শূদ্রের সেবায় বামুনদিগের জড়াজড়ি, এতেও দেশাচারের মুখে ছাই পড়ে না? হিন্দু পুরুষরা দেখি একটি কাজেও দেশাচার শাস্ত্রাচারের ধার ধারেন না; কেবল অভাগী রাঁড়ীরা শরমের দায় মরমের কথা বলতে পারে না বলে কি তাদেরই মাথায় সকল চাপ! সকল পাপ!!

সপ্তম বিলাপ

আমি অনাথিনী লো!
হবে না এ ভবে হেন অভাগিনী লো!!
নাহি জানি কোন্ দোষে,
জনমিয়াছিনু এসে,
পোড়া দেশাচারী দেশে, আমি পাতকিনী লো!
অকালে হারায়ে স্বামী,
হয়েছি নিরয় গামী,
আজীবন ভবে আমি, অপার দুঃখিনী লো!!
পুরুষেরা নানা ছলে,
দেশাচার পায়ে ঠেলে,
শুধু মোর ধরাতলে অদৃষ্ট ঘাতিনী লো!
বাবুদিগের তৃষ্ণাকালে,
দোষ থাকে না কোন জলে,
পোড়া কুলে রাঁড়ী হলেই চির চাতকিনী লো!!

অর্থাৎ দেবজ্ঞ গৃহস্থ ও ধর্মানুষ্ঠানে যশোযুক্ত ব্রাহ্মণ সেবাই শূদ্রের পরম শ্রেয়স্কর ধর্ম। আরও লেখা আছে, শূদ্রের কোনও যাগযজ্ঞ সম্বন্ধ নাই। (মনু ১১-১৩)

উক্ত মনু সংহিতাই হিন্দুর সর্বপ্রধান ধর্মশাস্ত্র। কেননা উহা বেদের রূপান্তর মাত্র। (দেখ ঃ মনু ২-৭)

যে বেদ শূদ্রের সম্মুখেও পড়িতে নিষেধ, আমরা দেখাইতে পারি, এখন অনেক শূদ্র বাবুরাই বেদ ও গায়ত্রীর অনুবাদক এবং ব্যাখ্যাকারক হইয়াছেন। বিধবা বিবাহ অপেক্ষা এটি গুরুতর বিষয় কিনা তাহা তাহারাই বুঝুন।

বাবুরা কথায় কথায় আমাদের শরত সুন্দরী আর গিরিবালার দৃষ্টান্ত শুনান, তারা নাকি বিধবা হয়েও সতী ছিল। কিন্তু দিদি বল দেখি! কোন বাবুটা তাদের মধ্যে ঢুকে মনটার ছবি দেখেছে, আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে আঁধার ঘরের খবরটা রেখেছে?[১]

আবার হতেও পারে, পুরুষের মধ্যে যেমন দু'একটা নামর্দা আছে, নারীর মধ্যেও তেমন ২/৫টা হবে! তাও না হোক, কিন্তু পুরুষেরা কত শত সাধু সন্ন্যাসী, গণেশ ও ভীষ্ম দেবের দৃষ্টান্তও মানেন না, তখন আমার কোথাকার শরত সুন্দরী ও গিরিবালার দৃষ্টান্ত শুন্‌ব ক্যান?

পুরুষদিগের কালে শাস্ত্র থাকে শিকায় তোলা!

যতেক দৃষ্টান্ত কথা রাঁড়ের বেলাই খোলা?

মুসলমানদের একটা নিকের বৌ বেরিয়ে যায় বলে আমাদের বাবুরা সময় সময় আমোদ মারেন ও নিকেটার দোষ ধরেন। আমিও বলি, কত বাবুর বিয়ের বৌও তা বেরিয়ে যায, ও স্বামী থাকতেও অসতী হয়। যেমন-কমল বাবুর বিমলা, কিরণ রায়ের হিরন্ময়ী, নবীন বাবুর এলোকেশী হয়েছিলো; তবে আর পুরুষরাই বা বিয়ে করেন কেন, আপন আপন কন্যা ভগ্নীদের বা তা দ্যায় কেন?

"বামন—এ কড়া শুনছ কার? তোমার!
দুই কড়া শুনছ কার? আমার!!
তাই নাকি?

নিকার পুত্র পিতা বলবেন কারে? বাবুরা তাই ভেবেই কাবু ও ব্যাকুল! আমিও বলি, ব্যাসদেব, কর্ণদেব সুদেষ্ণা দেবীর ছেলেরা, কুন্তী নন্দনগণ পিতা বলিতেন কারে?

পাপের পুত্রে দেবতা বল;
বাপের পুত্র দোষী হল?[২]

---

১. বুকে পাষাণ বান্ধিয়া এবং নরকানল তুল্য ভীষণ বিরহ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া অতি অল্প সংখ্যক বিধবাই যৌবনকালে ব্যভিচার কার্য হইতে বিরত থাকিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জ্ঞানের চক্ষে ন্যায়ের দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে তাহাদের প্রতি নিঃশ্বাস হইতে প্রজ্বলিত আগ্নেয়গিরির ন্যায় প্রবল বেগে খেদাগ্নি উদগিরণ হইতে দেখা যাইতে পারে। বহুতর বিধবা আবার হস্ত মৈথুন বা বিশিষ্ট যন্ত্র দ্বারা উৎক্ষোদক উদরস্থ করিয়া শুক্রপাত ও ক্ষণিক শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। সন্দিগ্ধ চিত্ত মহাত্মাগণকে তত্ত্ব লইতে অনুরোধ করি।

২. হিন্দু দেব দেবীদিগের বীভৎস কীর্তিকলাপ যিনি জানিতে চাহেন, তিনি আমার লিখিত "দেবলীলা" পুস্তক পাঠ করুন।

মুসলমানরা কোন্ গায়, কোন্ পাড়ায় গোরু কোরবানী করে, তারই হাম্বা ডাক শুনতে ঠাকুরদের কানগুলা হাজার হাত লম্বা হয়! মাংসের বাস নিতে নাকের ফাঁক ঢাকের মত হয়! আর গো দেবকে উদ্ধার করতে সমুদয় সংসারের মায়া মমতা, ভক্তি শক্তি, কল কৌশল, বল বিক্রয় তাদের অঙ্গে এসে ভর করে। কিন্তু তাদেরি ঘরে যখন ভ্রূণপাত বাচ্চা খুন হয়, তখন আর কিছুই থাকে না! তখন সকলেই বগাই বাম, ভম্বল রাম!!

শুনিলে গো বৎস বধ, সগর্জনে গদ্‌গদ্
বাবু দলে সিংহনাদ ঘন ঘন হয়।
ঘরে হলে নর খুন, আর নাই সান্ সুন,
ভস্ম হয় জ্ঞান গুণ, দয়া ধর্ম লয়!!

আহ! লো সরলা দিদি। আর কত কব? আমার দুঃখে দুঃখী হতে সংসারটায় কেউ নেই! বরং আমি কখন কি করি, কোন্ পথ ধরি সেই ভয়ে দাদারাও বাড়ীর সকলে চাকে পাকে আমার মরণটাকেই ডাকে। কেবল মা পোড়া কপালী আমার তরে সধবা থাকতেও বিধবা! মা আমারে ১০ মাস পেটে ধরে লো, তাই সে অভাগিনী মা আমার মমতাটা এখনো ভুলেনি। যখনি আমার পানে চায়, তখনি তার চোখ্ দুটা হতে ছল ছল করে জল বেরিয়ে মুখটা বুকটা ভেসে যায়। বাবা ঠাকুর আমায় তেল মাখতে, মাছ, মাংস ও রাতের বেলা ভাত খেতে দেন না; মা দুঃখিনীও আমায় ছেড়ে তা কিছুই মুখে দিতে পারেন না! সেদিন আমার কোব্‌রাজ দাদা বড় একটা রুই মাছ এনেছিলেন, বৌরা পেঁয়াজ মসলা দিয়ে ভাল মত পাকিয়েছিল; সেই মাছ খেয়ে সকলেই "ভাল মাছ, ভাল পাক, ভাল রাঁধুনী" বলে মাছের ও রাঁধুনীর গুণ গাচ্ছিলেন, আমি তাই শুনে মাকে বল্লুম যে, "ও মা, কোব্‌রাজ দাদা আজ বড় ভাল মাছ এনেছেন, বৌরাও ভাল করে পাক করেছেন, [illegible] তুমি যাও, যেয়ে দুখানি মাছ খাও!" আমার কথা শুনতেই সে দুঃখিনী কেঁদে কেঁদে বল্লে ও মা! তুমি আমার বড় সাধের তরঙ্গিণী, ও মা! তুই ভাত মাছ খেতে শিখলে, আমি তোকে থুয়ে আর কখনো মাছ মাংস মুখে দেইনি! বড় আশা ছিল মা, তুই শ্বশুর বাড়ী যাবি, স্বামীর কামাই খাবি, ছেলে মেয়ে পাবি, আমি তোকে এনে তোর ছেলে মেয়ের সাথে বসে মাছ মাংস খাব; হায়! আমার সেই আশায় ছাই, সে সাধে বাধ পড়েছে, আর এ জীবনে মাছ মাংস খাব না!"[১]

---

১. "মোনাগ্‌গাস বুওদ আয়শে আঁ তনে দোরস্ত।
কে বাশদ পাহলুয়ে বিমার সোস্ত—" (সাদী)
অর্থাৎ হোলেও নীরোগ, সুস্থ নহে কদাচন।
জ্বালাতন রোগী সনে থাকে যেই জন—

মায়ের এই পরান ভাঙ্গা কথা শুনে যেমন আগুনের তাপে মোম গলে, আমার প্রাণটাও সেইরূপ হল, তাই একপাশে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কাঁদলুম!

হা সরলা! আমার কি দুঃখের অবধি আছে? আমি না ভাই বৌ কটারও চোখের শেল! তাদের সেই ঘোমটা দেওয়া ঝ্যামটা, আর গাল বাঁকা ঝাল মাথা বোল শুনতে শুনতে পরানটা না অহোরাত্রই জ্বলে গেল! তাদের জ্বালায় না বাঁচতে পেরে কখনো সেই পোড়া শ্বশুর বাড়ীতে যাই, তাও দেখি জ্বালাটার বিন্দুমাত্র বিরাম নাই! সেখানে কয়টা এঁড়ে ধেড়ে দেওর আছে; তাদেরও খুসখুষি ফুসফুসি আমারি কাছে; তাতেও মনে ভয় হয়, পাছে জোলাবের হাতে ঠেক্‌তে হয়! তাই আবার এখানে!!

রাতটা হলেই বৌরা আমায় দেখায়ে দেখায়ে সারা গায় গয়না দিয়ে, গয়নার ঠমক ঝঙ্কার শুনায়ে, পাছা পেড়ে গুল বাহার, বানারসী, প্রভাবতী, চীনা, বোম্বাই, বসন্ত লতা, শান্তিপুরে ও চেলী ইত্যাদি, যার যা ইচ্ছা, সেই শাড়ী পরে পান খয়েরে গালগুলা লাল করে, বাহারের পরেও বাহার মেরে, রঙ্গে ঢঙ্গে ফিরে ঘুরে যার যে ঘরে সে যায়। দাদা খুড়োরাও পাছে পাছে গিয়ে কপাট এঁটে আটে, কাটে, ঘাটে ঘাটে খাটের পরে প্রেম তরঙ্গে সাঁতার দ্যান্! কেবল আমি পাপীয়সী চির উপোসা ঐ ঘরটায় যেয়ে সারাটা রাত উসিপুসি করেই মরি! আঃ দিদি! যখন বাবু বাবুনীদের আমোদ প্রমোদের কোলাহল আমার কানে আসে, তখন পরানটা অগাধ সাগরে ভাসে! তাই কখনো মনে হয়, আপন পরান আপনিই বাহির করে দিই![১] দিদি লো! আমার কাছে আর কেউ না, শুধু মা দুঃখিনী একবার আমায় পাহারা দিতে আমার ঘরে, আবার ঠাকুর সেবায় সে ঘরে রাতটা ভর হেঁটে খেটেই মরে। আ! জানিসনে লো যে দুঃখের নিশিটা পোহায়েও পোহায় না। ওঃ! না, তোরা তা জানিস্ কিসে! তোরা যে স্বামীর সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মধুর মিলনে, মধুর দোলনে, মুখটা মিলায়ে; বরং রাতটাকে আরো লম্বা করতে চাস্!!

"দুঃখনিশি পোহায়েও পোহাতে না চায়।
কে জানে যে সুখ-নিশি কোন্ পথে যায়।"

---

১. একটি বিধবার স্বহস্তে লিখিত পত্রাংশ দেখুন—"যেমন পাখী পিঞ্জরায় আবদ্ধ হইলে ছটফট করে, আমিও সেইরূপ ছটপট করিতেছি; মনে বলে যে, আপন প্রাণ আপনি বাহির করিয়া দি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিধবা গঞ্জনা
ও
বিষাদ ভান্ডার

তরঙ্গিণীর নিশি যাপন

লো সরলে! বৌ সকলে যেমন ঘরে যায়।
প্রেমের নাগর দাদারা মোর, পিছে পিয়ে ধায়॥
খুড়া খুড়ী বুড়া বুড়ী, তারাও সবে গিয়ে।
কহেন কথা দু দু মাথা এক বালিশে দিয়ে॥
পিতা ঠাকুর চাকুর বাকুর মেকুরপানা বুড়ো।
সেও লো দিদি! নিরবধি আদি রসের গুড়ো॥
আমার দায়ে, সোদরে মায়ে, ডাকতে নাকো পারে।
ফাঁক পাইলে নানান ছলে, কতই বাহার মারে॥
ঘরে যেয়ে মায় না পেয়ে বাপ ঠাকুরের মন।
উৎলে ওঠে, শোয় না খাটে রসেই উচাটন॥
ঘণ্টাখানেক, বৈসে অনেক, খুশ্‌খুশ্‌য়ে পাছে।
চাকে পাকে ডাকেন মাকে, যাইতে আপন কাছে॥
শাটের কথা বুঝতে হেথা মোর কি বাকী রয়?
জল দিয়ে যাও তেল দিয়ে যাও, ওসব কিছুই নয়॥
মা শ্রীমতী পরম সতী পতি সেবায় রত।
ডাকের শাটে, অমনি ছোটে হাউই বাজির মত॥
দৌড়ে যেয়ে জল যোগায়ে, ফল দিয়ে ঠাকুরে।
ঘুম পাড়ায়ে তড়তড়ায়ে, অমনি আসেন ঘুরে॥
আমার তরে, ঠাকুর ঘরে থাকতে পারেন নাই।
কমনে আমি, যাই না জানি, ভয়টা মনে তাই।
বড় বাবু, মেজো বাবু সকল বাবু যেয়ে।
যার যে ঘরে, খাটের পরে, বাহার মারেন শুয়ে॥
বৌগুলি ত, আমার মত, সব নব যুবতী।
শ্রী ও ছটায়, কম কেহ নয়, সমান রসবতী॥
বলব কি আর তাদের বাহার, সবেই রসের সরা।
দাদারা মোর, তেমনি ঘাগোর, নাগর পরানভরা॥
দু দু অঙ্গে রস তরঙ্গে সাঁতার যখন দ্যায়।
কৈব কি লো ও সরলা! ঢেউ লাগে মোর গায়॥
বৌ বাবুদের রস তরঙ্গর ঢেউটা যখন খাই।
প্রাণটা বলে, কপাট খুলে, হাটখোলাতে যাই॥

যেমন একটা জলের ফোঁটা, তপ্ত খোলায় প'লে।
ধবধবায়ে দ্বিগুণ হয়ে অম্‌নি উঠে জ্বলে॥
দাদাগণের কাণ্ডে মনে তেম্‌নি গতি হয়।
বল্লে সকল বল্‌বি পাগল মন তখন যা কয়॥
নিঝুম কালে, অগাধ জলে, যখন তরী যায়।
ঘুম নাহি যার, সেই জনা তার, মৃদু শব্দ পায়॥
ক্রমে আসি গভীর নিশি, উপজে এ ভবে।
প্রেম তরণী ছাড়েন অমনি বৌ-বাবুরা সবে॥
তাহাদিগের রস তরঙ্গের ধাক্কা ও ঢেউ খেয়ে।
মনের আগুন সহস্র গুণ গুজরে উঠে ধেয়ে॥
মনের জ্বালা ফুক্‌রে বলা যায় বা লো আর কত?
ঘুরতে লাগে অগ্নি যোগে চর্‌কি বাজির মত্॥
কখনও মন ভুবন ছেড়ে আকাশ পানে ওঠে।
কখনো মন গোসাঁইদিগের আক্‌ড়া মুখে ছোটে॥
ক্ষণেক পরান খাটের পরে, ক্ষণেক তক্তপোষে।
ক্ষণেক পরান ওসব ছেড়ে, মাটির পরে বসে॥
কখনো মন আতায় পাতায়, বাতায় ঝুলতে যায়।
কখনো প্রাণ কেওয়াড় খুলে দৌড় মার্‌তে যায়॥
রাত দুপুরের সময় এসে যখন চৌকিদার।
জাগো, জাগো, জাগো, বলে ছাড়ে লো হাকার॥
খাঁচার পাখী ঝাঁকের ডাকে যেমন ঝম্প ধরে।
প্রাণটা আমার চৌকিদারের হাঁক শুনে তাই করে॥
ক্ষণেক বলি কপাট খুলি ঐ বেটাকে নিয়ে।
বাবুনীদের মতন যেয়ে, আসি বাহার দিয়ে॥
ক্ষণেক পরান দৌড়ে চলে চণ্ডি মণ্ডপেতে।
চাকর বাকর আনন্দে গান গাচ্ছে যেখানেতে॥
ক্ষণেক পরান দৌড়ে উটে, আস্তাবলে গিয়ে।
সইসরা সব শুয়ে যেথা ঘোড়া ঘুড়ী নিয়ে॥
বল্‌ব কি লো রাতটা সারা জ্বলে পুড়েই মরি।
একবার উঠি একবার বসি, উসিপুসি করি॥
রাতটা ভরে ঘুম যে তা বলতে পারি নাই।
বল্‌বি পাগল মনে মনে যত জাগায় যাই॥
জ্বলতে জ্বলতে রাতটা আমি পোহাই ভবের পরে।
সবার তরে স্বর্গ রাতি, নরক আমার তরে॥

বৌরা প্রাতে বাইরে আসে, এল থেল চুলে।
আমার পোড়া পরান চড়ে, বিষ মাখানো শূলেত্রা॥
কাঙ্গাল কবি কহেন যদি বুদ্ধিমতী হও।
ও দুঃখিনী তরঙ্গিণী! কল্‌মা এসে লও॥
পাপী কুলে কেন জ্বলে জীবন ভস্ম কর।
ভক্তি মনে যুক্তি শুনে মুক্তির উপায় ধর॥
ইহকালে পরকালে, পরম সুখী হবে।
নৈলে, একাল সেকাল দু'কাল নরক মাঝেই রবে॥

তরঙ্গিণীর উক্ত শোকালাপ শুনিতে শুনিতে সরলাও শোকে অধীরা হইয়া অতীব ক্ষুণ্ন হৃদয়ে বিদায় লইয়া স্বীয় পিত্রালয়ে গেলেন এবং অল্প দিন পরেই যাইয়া পতির গৃহ আলোকিত ও তৎপ্রণয়ামৃত পানে অন্তরে অনন্ত শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে অনাথা তরঙ্গিণী অনন্ত সন্তাপ-তরঙ্গে নিপতিত হইয়া নিরন্তর সেই অসহ্য তরঙ্গাঘাতে ছিন্নবিছিন্ন অবস্থায় অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে প্রতি মুহূর্তে শোকোচ্ছাস উদ্‌গার করিতে লাগিল।

অনন্তোচ্ছাস

(১)

হায় লো সরলা! কোথা গেলি মোরে ফেলে!
আমি এ বিজন বনে, পুনরায় কার সনে;
মনের গভীর দুঃখ বলিব লো খুলে॥

(২)

নিবিড় কানন মাঝে আমি অনাথিনী!
হারায়ে হৃদয় রবি ধরিয়ে বিষাদ ছবি,
বিঘোর ধরায় হায়! ভ্রমি একাকিনী!!

(৩)

এ পাপ জগতে নাই মোর ভালবাসা!
আত্মীয় স্বজন যারা, জ্ঞানান্ধ পাষণ্ড তারা,
দেখেও দেখে না (মোরে) কারে কই মনো আশা!!

(৪)

মেসো মাসী প্রতিবেশী কেহ না তাকায়!
প্রতিবেশিনীরা সবে, আনন্দে বিরাজে ভবে,
মন সে আনন্দ কাল নিরানন্দে যায়!!

(৫)

সধবা কামিনী সবে লয়ে আভরণ!
পরে মনোহর শাটী, করে অঙ্গ পরিপাটী,
মজে সুমধুর প্রেমে তোষিছে পতির মন!!

(৬)

শৈশব সঙ্গিনী যারা ছিল মোর হায়!
আজ তারা ফুল্ল মনে, অহরহ পতি সনে,
প্রণয় পীযূষ[১] পানে, মোহিত সবায়!!

(৭)

এ পাপ ভারতে আজ আমি পাতকিনী!
হারায়ে জীবন-শশী, তমস কান্তারে বসি,
বিন্ধিয়ে বিরহ বাণে মরি একাকিনী!!

(৮)

এ নব যৌবন হায় বিরহে শুকায় লো!
শুকাল কমল কলি, এ দুঃখ কাহারে বলি,
পাষণ্ড আত্মীয়গণ ফিরেও না চায় লো!!

(৯)

হা ইংরেজ শ্বেতকায় মহাবীর দল!
ধরে সবে বীর-বেশ, উদ্ধারিলে কত দেশ,
(হায়!) বিধবা উদ্ধার তরে হলে দুরবল?

(১০)

তোমাদের দয়া শুনি ভূমণ্ডল জুড়ে!
নির্দয় হিন্দুর ঘরে, বিধবারা কেঁদে মরে,
তাদিগের তরে তাহা যায় নাকি পুড়ে?

(১১)

কোথা গো বেন্টিং! কোথা হে রামমোহন!
নিবারিয়া চিতানল, জ্বেলে দিয়া কালানল—
জ্বালাইলে আজীবন বিধবার মন॥[১]

---

১. পীযূষ—অমৃত বা সুধা। পূর্বকালে হিন্দুরা বিধাবাদিগকে তাহাদের স্বামীর সঙ্গে শ্মশানে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিত, তাহাকেই 'সহমরণ প্রথা' বন্ধন। যে বিধবা মরিতে অস্বীকার করিত, পাষণ্ড হিন্দুগণ তাহার হস্তপদ বান্ধিয়া সেই জ্বলন্ত আগুনে ফেলিত। পাছে সেই বিধবার হৃদয় বিদারী কাতর ক্রন্দন ও গগন বিদারী চীৎকারে কাহারো অন্তরে মমতার উদ্রেক হয়, তজ্জন্য হিন্দুগণ চিতার চারি পার্শ্বে ঢাক ঢোল বাজাইয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিত। (বাঙ্গালা ১২৩৬ ইং ১৮২৯) সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতবর্ষের তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বাহাদুর ব্রাহ্ম গুরু রাজা রামমোহন রায়ের যত্নে আইন দ্বারা সেই নৃশংস সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দেন।

(১২)

সহমরা ভাল ছিল দুঃখ তাপ রহিত না!
বিন্ধে এ বিশাল শূলে, ভারত শ্মশান কুলে,
বৈধব্য চিতায় চিত্ত আজীবন দহিত না!!

(১৩)

ধন্য, মান্য পুণ্য রাজা প্রমথ ভূষণ রায়!
সুকোমল চিত্তখানি-মুখে মধুমাখা বাণী,
নাশিতে বিধবা দুঃখ জনমিলে এ ধরায়!![১]

(১৪)

বিধবার দুঃখে দুঃখী হয়ে রাজা মহাশয়!
ত্যাজিয়া রাজত্ব সুখ, নাশিতে অবলা দুঃখ,
অকাতর চিতে কত করেন বিভব ক্ষয়!!

(১৫)

ভাবিলাম নলডাঙ্গায় ভেসে পূর্ণ দিবাকর!
বিকাশি কিরণ রাশি, ঘুচায়ে তমসা নিশি,
পুনরায় বিধবায় দেখাবে নূতন বর!!

(১৬)

মাতিল বিধবা অঙ্গ, শুনে এ আনন্দ বাণী!
যেমন কাঙ্গাল জন, পাইলে বিপুল ধন—
মাতে সে নীরদ নাদে যেই মত চাতকিনী!!

(১৭)

আশার ভেলায় চড়ে দুঃখ নীরে ভাসি!
নিশির স্বপন প্রায়, সে আশা নাশিল হায়,
ঢাকিল নিবিড় মেঘে সে কিরণ রাশি!!

(১৮)

ঘাতকী পাতকী যত পাষাণ হৃদয়!
নারকী নিষ্ঠুর জন, পাষণ্ড পামরগণ,
বিধবার নবানন্দে নিরানন্দ হয়।[২]

---

১. যশোহর—নলডাঙ্গাধিপতি মহাত্মা রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায় মহাশয় বিগত ১২৯০ সালে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন জন্য ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়া ছিলেন। প্রশংসিত রাজা বাহাদুর বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়া মাত্র ২/৩টি ভদ্র বংশীয়া হিন্দু বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন; সেই ভাগ্যবতীরা এখণ পুত্রবতীও হইয়াছেন।

২. কতকগুলি নিষ্ঠুর প্রাণ গোঁড়া হিন্দুর চক্রান্তে পড়িয়াই প্রশংসিত রাজা বাহাদুর উক্ত সাধু কার্যে অকৃতকার্য হন।

(১৯)

কত শত হাকিমে যে বিচারে নিপুণ শুনি!
ষাঁড়ের বিচার কালে তারাও মূর্খের দলে,
কে না বলে তাহারাই নারকী মানব খুনী!!

(২০)

কত ব্যারিষ্টারে নাকি খুনীকে বাঁচায় ফাঁসী!
(কিন্তু উদ্ধারিলে নাকি খুনীকে রক্ষা পায়,
সে কথা ভাবিতে হয় তারাও ঘোড়ার ঘাসী!!

(২১)

যে তক বিধবাগণ দগ্ধ হবে মনানলে;
তত কাল বিনা স্বামী, জননী জনম ভূমি,
থাকিবে ভারত তুমি! বিদেশীর পদ তলে!!

(২২)

হে দুঃখিতে! কত কাল দহিয়া মরিবে?
সাদরে মেহের কয়, না করে জীবন ক্ষয়,
কলেমা করহ সার দুকালে তরিবে!

দয়ার সাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১)

হা বিদ্যাসাগর, দয়ার মূরতি!
নাই তুমি আর,
তুমি মাত্র সার,
ছিলে বিধবার হৃদয় সারথী!

(২)

করে এ ভারতপুরী অন্ধকার!
হইয়া নিদয়,
তব সে হৃদয়,
লইল বিদায়, হায় কি প্রকার?

(৩)

কুক্ষণে আইল (১২৯৮) অষ্টন'ই সাল!
তেরই শ্রাবণ,
অবলার ধন,
করেছে হরণ নিরদয় কাল!!

(৪)
(যে কাল!) করিলি আঁধার তুই বঙ্গপুরী!
রজনী দুপুরে,
সে গুণ আকরে,
নিদয় অন্তরে, করিলি রে চুরি?

(৫)
বল রে নিঠুর কাল একবার—
ভারতের পরে
অত সকাতরে
বিধবার তরে কান্দিবে কে আর?

(৬)
সেই আশা তরী ছিল বিধবার!
এ বিষাদ নীরে,
ভাসিত সুধীরে,
তাও রে অচিরে, ডুবালি আবার!!

(৭)
ভাসে বিধবারা চির অশ্রু নীরে!
স্নেহ পূর্ণ স্বরে—
কান্দিয়া, স্ব করে—
মুছাবে সে নীরে, কে আর সংসারে?

(৮)
হায়! হায়! আর কত অকাতরে!
বিধবা তারণে,
বিপক্ষের সনে,
যাবে রে কে রণে ভারত প্রান্তরে?

(৯)
বিধবার হয়ে কে আর কহিবে?
দিয়া ধন প্রাণ,
বিপক্ষের বাণ,
পাহাড় সমান, কে আর সহিবে?

(১০)
হীন কবি কয়, সেই মহোদয়—
ভারত ব্যাপিয়া,
যে বীজ রোপিয়া
গেছে অঙ্কুরিয়া (কালে) ফলিবে নিশ্চয়।[১]

---

১. কবির ভবিষ্যতবাণী সফল হইতেছে। প্রকাশক

মাতা মহারাণী ভারতেশ্বরী

বিবিধ ছন্দ

ধন্য মাতা মহারাণী ভারত-জননী;
তুমিই মা রমণী কুলের শিরোমণি।
সর্বত্র ভাসিল তব সুযশ সৌরভ;
তুমিই রক্ষিলে মাতঃ! রমণী গৌরব।
কত শত ভূপতি ও সুপণ্ডিতগণ;
তোমার চরণ পূজা করে আজীবন।
শুনিলে তোমার নাম ভীত খল জন;
আনন্দেতে গদ্‌গদ্ হয় সাধুগণ।
পুত্র কন্যা সম তুমি দেখ প্রজাগণে;
তুই দয়াময়ী নাম তোমার ভুবনে॥
শাসিয়াছ ও মা তুমি চোর দস্যু দলে;
নাশিয়াছ তমঃ তাপ, স্বীয় পুণ্য বলে।
ইংলণ্ড ভারত আরো কত জনপদ!
তোমার দয়ায় মাতঃ! পেয়েছে সম্পদ।
যে দিন বসেছ তুমি রাজসিংহাসনে;
করেছ প্রতিজ্ঞা শুনি, সভাসদ সনে।
সমদৃষ্টি রাখিবেক সরল অন্তরে;
ছোট বড় নর নারী সবাকার তরে।
সত্যই পেলেছ মাতঃ! নিজ অঙ্গীকার;
করনি কিছুই সত্য, অতিক্রম তার।
নারী হয়ে শাসিলে মা মহা মহা দ্বীপ;
জ্বালাইলে কত দেশে সভ্যতা প্রদীপ!!
অপরূপ কাল, ও মা দেখাইলে তুমি;
ব্রিটনে করিলে জগতের কেন্দ্র ভূমি;
এক পাত্রে খাওয়াইলে বাঘে ও ছাগে;
একাসনে বসাইলে গরুড় ও কাগে।
করিলে মা তুমি অসম্ভবে সম্ভবিত;
পুত্র সম প্রজা তব সদা প্রফুল্লিত।
যাবত প্রচণ্ড সূর্য গগনে ভাসিবে;
যেতক নির্মল শশী আকাশে হাসিবে,
যদবধি শূন্যে হবে নক্ষত্র উদিত;
তব যশঃ-কীর্তি ভবে রবে সুবিদিত।

লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রাণ মন খুলে;
চাহিছে মঙ্গল তব সবে কর তুলে।
কোটি কোটি কণ্ঠ ভবে সুতান ধরিয়া;
তব স্তব গায়, তুমি ধন্যা ভিক্টোরিয়া।
কিন্তু মাতঃ। মোরা তোর অনাথিনী মেয়ে;
কখনো মোদের মুখ দেখিলি না চেয়ে।

তাই—
কেমনে হৃদয় খুলে, এ কর যুগল তুলে,
বিধির গোচরে।
তোমার মঙ্গল চাই, বুঝাইয়া বল তাই
ও মা মোর তরে!
গাইব কি গুণ আর, হৃদয়ের অন্ধকার,
মম না ঘুচালে।
সদা করে টলমল, আমার নয়ন জল,
তা তো না মুছালে
যদি মা না দেখ চেয়ে, বলিয়ে দূরের মেয়ে,
বলে দাও তবে।
তোমার চরণ ছেড়ে, কান্দিব কোথায় পড়ে
মোরা আর ভবে॥
ওঃ!
মেয়ে হয়ে ও মা তুমি,
মেয়ের মনের ব্যথা—
বুঝিলে না হায়, হায়!
ইহাই খেদের কথা।
ষাটী শাল কাটিল মা!
ভারত ঈশ্বরী হলে।
শিহরে শরীর মন,
সে কথা স্মরণ প'লে!!
প্রতি দশ বর্ষ পরে,
তব ভক্ত প্রজাগণ।
আনন্দ উৎসবে ভবে,
সবেই মাতায় মন।
বল বল বল মাতঃ!
আমরা বিধবা সবে।
কেমনে মাতিব সেই,
জুবিলীর মহোৎসবে?

চিরকাল এ বাসনা
মোদের মনেতে আছে;
হৃদয় লাঞ্ছিত ভিক—
পাইব মায়ের কাছে!
কেননা মা জান তুমি,
সেই কথা সমুদয়।
কোন্ সময়েতে মেয়ে,
কিসের ভিখারী হয়!
তাই বলি ও গো মাতঃ!
তুমি ত নিজেও মেয়ে!
বিধবা মেয়ের পানে,
কেন গো দেখ না চেয়ে?
ও মা তুমি ইহলোকে,
বিরাজিবে যত দিন।
বিধবা মেয়েরা তব,
হইবে না আশাহীন।
যেদিন বৈকুণ্ঠে বাস,
করিবা গো মনোনীত।
সেই দিন ফুরাবে না,
বিধবার আশা গীত।
বিধবা মেয়ের মনে,
যে আগুন আজীবন।
জ্বলে গো মা! ভাবিয়াছ,
তা কি তুমি কদাচন?
এই না সেদিন তব;
জুবিলী সামনে নিয়ে!
কাঁপিল ভারত ভূম;
সর্ব অঙ্গ শিহরিয়ে।[১]
কত পণ্ডিতেরা তার;
কৈল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।
বিধি ভিন্ন কেহ আর;
জানে না সে লেখা জোখা॥

---

১. মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলীর ২/১ দিন পূর্বে ১০ই মহররম, ১৩০৪ সনের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গদেশে মহাভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, অনেকের মতে উহা বঙ্গ বিধবার বিষাদানল সম্ভূত প্রবল কম্পন।

কতজন কত মত;
বিদ্যা বুদ্ধি খাটাইল।
কতজন কতজনে,
যুক্তি তর্কে হটাইল॥
কিন্তু গো মা যে কারণ,
জুবিলী সামনে করি।
দুলিল ভারত রাজ্য,
সর্ব অঙ্গ থরথরি॥
সে নিগূঢ় ভাব লাভে;
কেহ না সক্ষম হ'ল।
শুধু গোলে হরিবল;
গণ্ডগোল করে ম'ল॥
সার তত্ত্ব চাও যদি,
শুন গো জননী এই।
পাপের চাপন ভিন্ন—
এ কম্পনে কিছু নেই॥
কেননা মা!
হৃদয়াগ্নি বিধবার,
নিঃসারিয়া অনিবার,
ভূতলে পশিছে তার নিদারুণ তাপ।
(আরো) সুবিদিত সর্বভূত,
অসংখ্য নিষ্পাপ সুত,
হয়েছে স্ব-স্থানচ্যুত, সেও পাপ চাপ॥
ধরণী ধরিতে আর,
পারে না সে গুরুভার,
বক্ষ পরে আপনার, তাই তো সেদিন।
ও মা তব আয়ু তরে,
আশী বর্ষ প্রায় হেরে,
কাঁপিল ধরণী থরে, হয়ে আশা হীন।
একে তো অনল তাপ,
আরো সে পাপের চাপ,
তাহে সদা অভিশাপ, অনাথিনীদের॥
যেই দেশে এইমত,
পাপাচার অবিরত,
সেই দেশে বল মাতঃ! আনন্দ কিসের?
ষাটি সাল গেল চলে,

তোমার চরণতলে,
থেকেও পাপেতে জ্বলে হইয়াছে ক্ষয়
তাই বসুমতী মেয়ে,
আনন্দ বুঝিতে পেয়ে,
নিজে বিধবার হয়ে কাঁদিল সেদিন।
মেয়ে হয়ে তুমি যে মা,
মেয়ের দুঃখ বুঝিলে না,
পুরুষে না বুঝিবে তা, কভু এই ভবে,
কি কভু ভারত পুরে,
ও রাজ-কিরীট ফিরে;
উঠিয়া মেয়ের শিরে ষাটি সাল রবে?
এমন কপাল কার,
বল গো মা হবে আর,
সসাগরা ধরা যার, করুণা ভিখারী।
বুঝিব না আর ভবে,
যাবত মানুষ রবে,
তোমা সম নাহি হবে দয়াময় নারী।
না জানি কি পুণ্য ফলে
তোমার জীবনকালে,
পেয়েছি মা ধরা তলে, মানুষ জীবন।
রলেও অন্তরে দুঃখ,
চাহিয়া তোমার মুখ,
আশায় জুড়াই বুক, ঢাকিয়া বদন।
তাই মা সজোড় করে,
নিবেদি চরণ পরে,
দুঃখিনীদিগের তরে দুটি কথা কও।
তাদিগে না হও বাম,
বিধবা তারিণী নাম,
ধরিয়া, অক্ষয় ধাম নিবাসিনী হও।[১]

---

১. মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবদ্দশায় ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের কয়েক দিন পরে এই প্রবন্ধ রচিত হয়।

সন্তাপিত পাখী

চোক্‌গ্যাল! চোক্‌গ্যাল!! চোক্‌গ্যাল!!!
হে বিহঙ্গ! কে তুমি গো নিশি শেষ হলে—
কাঁদিতেছ চোক্‌গ্যাল চোক্‌গ্যাল বলে?
বল রে বিহঙ্গ তব হৃদয়ে কি দুঃখ,
কি হেতু চোক্‌গ্যাল বলে ভাসাইছ বুক?
দেখিছ না শোক তাপ নিবারিয়া সবে;
প্রাণীগণ মন-সুখে শায়িত নীরবে।
চারিদিকে দেখ ভবে সবে সুখী মন;
শাখী শিরে সুখী তব সঙ্গী পাখীগণ।
বল বল কি যাতনা তব চক্ষে তবে॥
কাঁদিছ কি দুঃখে সদা "চোক্‌গ্যাল" রবে?
গিয়াছেন দিনমণি যেই অস্তাচলে;
সবাকে যামিনী মাতা সেই নিল কোলে!
স্তন্যপায়ী মাতৃ পয়োধর লয়ে মুখে;
যেমন নিতাপ হয়ে নিদ্রা যায় সুখে।
দেখিছ না রে বিহঙ্গ; বিশ্ববাসী সবে,—
তেমনি সুষুপ্ত আছে নিঝুম নীরবে।
কিসের যাতনা তোর বল দেখি তবে,
কেন কাঁদ "চোক্‌গ্যাল চোক্‌গ্যাল" রবে।
তুমি যে তটিনী তটে শিরে বিটপীর—
বসে আছ, দেখ সেই তটিনীর নীর,
প্রভাতের নিরমল সমীর সেবনে—
পুলকে তরঙ্গায়িত হইছে সঘনে।
প্রিয় আগমন বার্তা হইয়া বিদিত,
সরোজন্মা সরোজিনী সবে অমোদিত।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগণ তাহারাও সবে,
জপিছে বিভুর নাম "সাঁই সাঁই" রবে!!
সুখী জন শুনিবে কি তোমার ক্রন্দন,
কেন হে "চোক্‌গ্যাল" বোল, বল অনুক্ষণ?
রে বিহঙ্গ প্রকাশিয়া বল তাহা মোরে;
এ দুঃখিনী বিনে কে তা জিজ্ঞাসিবে তোরে।
দেখিছ না শূন্যে ঐ নক্ষত্র নিকর,

প্রদীপ প্রদীপ সম বিতরিয়া কর—
নিশা অন্তে প্রচারিয়া দিনেশাগমন,
সানন্দে বিলীনে ক্রমে করিছে ভ্রমণ।
তাই বলি অভাগিনী বিনে আর ভবে—
কর্ণপাত করিবে কে তব ঐ রবে?
রে শাখী শিরস্থ পাখী, জান তুমি কিনা;
বুঝে না দুঃখীর দুঃখ দুঃখাতুর বিনা।
বুঝেছি বুঝেছি আমি রে দুঃখিনী পাখী;
যে অনলে জ্বলিতেছে তোর দুটী আঁখি।
জগতের সব গৃহ সুখ সরোবর;
দুঃখানল কোথাও না আছে তিল ভর।
দুঃখ তাপ নাই ভবে, কিন্তু বিধবার;
গৃহখানি বটে সপ্ত নরকের দ্বার।
বিধবা অঙ্গটা বটে অঙ্গার মূরতি;
অনলেই ভস্মীভুত বিধবা নিয়তি।
সত্যই অনল উৎস বিধবা হৃদয়;
নরকের শাখা তার ইন্দ্রিয় নিচয়।
পরেছে বিধবাগণ অনলের সাজ;
আমি সে বিধবা হায়! রে বিহঙ্গ রাজ!!
জ্বলে গো হৃদয় মোর স্বপ্ন জাগরণে;
জ্বলে গো আগুন মোর অঙ্গ আভরণে।
জ্বলেরে আগুন মোর কপাট চৌকাটে;
জ্বলেরে আগুন মোর বিছানে ও খাটে।
জ্বলেরে অনল মোর অন্ন আর জলে;
জ্বলেরে অনল মোর রেজাই কম্বলে।
জ্বলেরে অনল মোর মশারি চাদরে;
জ্বলেরে অনল মোর হৃদয় কন্দরে।
জ্বলেরে অনল মোর হাঁড়ী ও কলসে;
জ্বলেরে অনল মোর কাঁথা ও বালিশে!
জ্বলেরে অনল মোর মাদুর পাটিতে;
জ্বলেরে আগুন মোর মেজের মাটিতে
জ্বলিছে আগুন মোর সকল বাড়ীতে;
জ্বলিছে আগুন মোর পরুন শাড়ীতে।
জ্বলিছে আগুন মোর পিতার দুচোখে;
জ্বলিছে আগুন মোর স্বজাতির মুখে।

অগ্নি উদগিরণ হয়, আমার নিঃশ্বাসে;
তাই তো অনল বাত্যা উত্থিত আকাশে।
রে বিহঙ্গ তুই বুঝি হয়ে অন্য মন;
দৈবাৎ করিয়াছিলি আঁখি উন্মীলন?
হৃদয় নিঃসৃত মোর সে অনল যেয়ে;
লাগিয়াছে বুঝি তোর খোলা চোক পেয়ে?
সেই কালানলে তোর চোক যায় জ্বলে;
তাই বুঝি কাঁদ সদা "চোক্‌গ্যাল" বলে?
কবি কহে করিয়াছ সত্য অনুমান,
কলেমা পড়িয়া কর অনল নির্বাণ!!

নবম বিলাপ

দহে প্রাণ সদা বিরলে—
এ অঙ্গ বিষাঙ্গ হল মহা গরলে!
সে মদন ভূজঙ্গম,
দংশিছে অঙ্গেতে মম,
সে বিষে বিষম জ্বালা সতত জ্বলে;
নাহি বৈদ্যরাজ পতি,
কে দিবে ঔষধ রতি,
পাব তাহে অব্যাহতি সে বিষানলে!
পিতা খুড়ো সদোহর,
সকলি হয়েছে পর,
আমি কার কে আমার এ ধরাতলে?

লক্ষিত সন্তাপ

ত্রিপদী

চারি দিক্ নিরখিয়া, বিদরে বিধবা হিয়া,
তাই দুঃখাতুরা তরঙ্গিণী।
দুঃখ ভার লয়ে শিরে, ভাসিল বিষাদ নীরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে একাকিনী॥

কহে, রে নিদয় বিধি, না জ্বালায়ে নিরবধি,
মারিলে মায়ের গর্ভে মোরে॥
তবে আর এ যাতনা, সহিবারে হইত না;
হেন কাল কুলাঙ্গার ঘরে॥
ওরে সূর্য শুন শুন, ডুবিয়া ভেসেছ পুনঃ;
ডুবেছে আমার সূর্য পতি॥
ফিরে না উদিবে আর, চিরতরে অন্ধকার,
রবে মম পোহাবে না রাতি॥
হায়! সমাগমে দিনমণি, বিকশিত কমলিনী,
ভৃঙ্গরাজ রঙ্গে মাতোয়ারা॥
সধবা যুবতীগণ, হেরে পতি চন্দ্রানন;
পায় বটে অমৃত ফোয়ারা॥
আমার কপাল পোড়া, হয়েছি প্রাণেশ ছাড়া;
হায় সে প্রাণের মধুকর॥
এ নব সরসী ছেড়ে, অকালে গিয়াছে উড়ে;
শূন্য করে কমল নিকর॥
শুন গো যামিনী দেবী, অস্তাচলে গেলে রবি,
রাজত্ব তোমার ধরাতলে॥
সবে বলে জয় জয়, সুখে প্রফুল্লিত হয়;
দুঃখেতে আমার মন জ্বলে॥
সধবা যুবতী যত, মনে মনে অবিরত,
থাকে গো পতির পথ চেয়ে॥
আসিলে ত্বরায় রাতি, বাসরে আসেন পতি,
বাসনা পুরায় পতি পেয়ে॥
নাগর নাগরী দুয়ে, সুখের শয্যায় শুয়ে,
সকৌতুকে রজনী পোহায়॥
আমার শয্যার তলে, নিত্য কালানল জ্বলে,
বিনা সে নাগর রসরায়॥
যামিনী সুখের আশ, আনন্দ শয্যায় বাস
ছাড়িয়া ডুবেছি মহানদে॥
ঠেকেছি ভীষণ দায়, নাহি সে ডুবুরী হায়!
কে তরাবে এ ঘোর আপদে?[১]

---

১. একটি হিন্দু বিধবা ভীষণ মনোকষ্টে পড়িয়া একদা একখানি পত্রে লিখিয়াছেন। যথা—"আমার জন্য দুঃখ ও আমার কষ্টে কষ্টিত হয়, আমি ইহা ভারতবর্ষে দেখি নাই; আমি সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, আর অধিক কি লিখিব। "আশি চাতকিনীর ন্যায়" ইত্যাদি।

অই গো পূর্ণিমা শশী, উজ্জ্বল করেছে নিশি,
অমাবস্যা লেগেছে আমার।
হায় সেই নিশামণি, মম ভাগ্যাকাশখানি,
করে গেছে চির অন্ধকার॥
আহা কি বিমল কর, বিতরিছে সুধাকর,
হেরিয়া চকোর পুলকিত।
আমার হৃদয় শশী, নাহি তাই ঘোর নিশি;
আর না হইবে আলোকিত॥
শুন রে তারকারাজি, তোমরা সকলে আজি
করেছ শোভিত শূন্যাকাশ।
আমার জীবন তারা, অকালে হয়েছি হারা,
তাই শোভাহীন বার মাস॥
ও গো অনাথিনীগণ! বুঝিবে না কদাচন,
দুঃখ আত্মীয়েরা তোমাদের।
যাইবে দুকাল দুঃখ, পাইবে অনন্ত সুখ,
লও ত্বরা যুক্তি মেহেরের।

বৌ কথা ক!

কে তুমি নিশীথকালে
বসে পিক্‌রাগ ডালে,[১]
"বৌ কথা কও" বলে গাও বার বার?
গাইয়া মধুর গান,
হানিয়া দুর্জয় বাণ,
বিধবার ভাঙ্গা প্রাণ ভাঙ্গিলি আবার!
খাও গো আমার মাথা,
দিও না ব্যথায় ব্যথা,
কার সাথে কই কথা, ভবে আমি আর?
যাও পাখী যাও যাও,
সেই দেশে যেয়ে গাও,
যে দেশে দেখিতে পাও পতি বিধবার!
আমি সে নামের বৌ
কাজে কিছু না আদৌ,
কথার মানুষ কেউ নাই গো আমার!

---

১. পিকরাগ—আম্রবৃক্ষ।

কে গো আনন্দে গলে,
যাইতেছ ঢলে ঢলে,
"বৌ কথা কও" বলে, তুমি অনিবার।
নিদারুণ তোর স্বর,
নিতান্ত অসহ্যতর,
গাইও না নিশি ভর,—ওগো তুমি আর!
"বৌ কথা কও" শুনে,
কালানল জ্বলে মনে,
যেন শত বাণ হানে হৃদয় মাঝার!
রে পাখী! গাইয়া ধীরে,
আমাকে বিষাদ নীরে—
নাহি গো ডুবাও ফিরে, কহি বারে বার!
বিধবা বউরা সবে,
যতকাল ভবে রবে,
কেহ নাহি কথা কবে নিশাকালে আর!
"হীন কবি" কহে দিদি,
এখনো বুঝহ যদি,
কথা কতে নিরবধি পারিবে নিশ্চয়!
পড়িয়া কলেমা হার,
বরিয়া নবীন বর,
কর সে চরণ সার, দুঃখ হবে লয়।

ষড়ঋতু

বসন্তকাল

ত্রিপদী

রে বসন্ত ঋতুরাজ! ধরিয়া মোহন সাজ,
তুমি আজ উপনীত ভবে।
হেরে তব আগমন, মোহিত এ ত্রিভুবন,
জীবগণ আমোদিত সবে—
দুরন্ত বিগত শীতে, পলাশীরা ক্ষুণ্ন চিতে,
পত্র পাতে পলিত হইল।
বহিলে বসন্ত বায়ু, তাহারাও নব আয়ু,
পুনরায় সকলি পাইল—
গোলাপি শ্যামল পীত, নানা বর্ণে পল্লবিত,
মুকুলিত হয়ে তরুবর।

অমর সমীর পানে, পত্র ঝর ঝর তানে,
স্থির মনে কুড়াইছে বর॥
হেন সুবসন্ত কাল, আমার হইল কাল,
সুকালে অকাল হল হায়!
হয়েছি নাগর হীন, তাই এ সুখের দিন
চিরদিন দুঃখে মোর যায়॥
বসন্ত সমীর পান, করিয়া কোকিল গান,-
করে, প্রাণ খুলে প্রিয় সনে।
সে গানে জীবন মন সুখে হয় উচাটন,
হানে বাণ বিধবার মনে॥
শুন শুন রে কোকিলা, জান না বিরহ জ্বালা,
তাই কালা, গাও বারে বার।
তব অই মধু রবে, মোহিত সধবা সবে,
ফাটে ভবে চিত্ত বিধবার॥
জানি না বিধাতা কেন, এ পোড়া ভারতে হেন,
সুবসন্ত ঘরে ঘরে দ্যায়॥
জানি না কোকিল সবে, অত মধুময় রবে,
কেন এ ভারতে পুরে গায়॥
বসন্ত সমীর মম, নরক অনল সম,
হল সে হৃদয় নাথ বিনে॥
কোকিল কণ্ঠের স্বর, নিশিতে বিষাক্ত শর–
সম, মম বাজে এ পরানে!!

গ্রীষ্ম

হ-রে নিদারুণ গ্রীষ্ম! দহিতে বিশাল বিশ্ব
বুঝি বিশ্বে তব আগমন।
তা' নলে বিশ্বের পরে, ভীষণ ভাস্কর করে
কেন করে অনল বর্ষণ?
তোমার ভীষণ তাপে, ভয়ে চরাচর কাঁপে,
ধপ্ ধপ্ করে সব দেশ॥
হেরে সে প্রতাপ হায়, রক্ত মাংস গলে যায়
ঘামিয়া জীবাঙ্গ হয় শেষ॥
কিন্তু যে বাসরে হায়, নাগরী নাগরদ্বয়,
দাম্পত্য প্রণয়ে নিমগন॥

বহে সুসমীর তথা, রে গ্রীষ্ম যাইতে সেথা
তুই না পারিবি কদাচন॥
একে অসময় আসি, আমারে নিরয়-বাসী—
করিয়াছে নিরদয় যম॥
তাই বলি ওহে গ্রীষ্ম! ফিরে কি আমার ভস্ম—
করিতেই তোর সমাগম?
হা নিদাঘ নিদারুণ, জ্বালা গায়ে শত গুণ
দিও না আগুন আর, যাও।
বিয়ে হলে বিধবার সহে না পরানে যার,
যেয়ে তারে সবংশে জ্বালাও।

বর্ষা

ভীম গ্রীষ্মানল গতে, বিধির বিধান মতে,
সুখ বর্ষা আসিল ভুবনে।
তাই নবোদ্যমে আজি, গভীর নিরদ রাজি
ঐ বুঝি ভাসিল গগনে?
ত্বরা বরষিল ধারা, রসে টলমল ধরা,
সুখে মাতোয়ারা প্রাণী বর॥
আছে যার প্রাণকান্ত, সেই কান্তা চির শান্ত,
রয়েছে প্রশান্ত কলেবর?
হেরিয়া বরষা কাল, প্রফুল্লিত পদ্ম নাল
হেলিছে দুলিছে পদ্ম ভরে॥
উল্লাসে দুলালে অলি, করে দিয়া করতালি,
পদ্ম পরিমল পান করে॥
বরষিলে কাদম্বিনী, হরষিত চাতকিনী,
কেতকিনী শোভিত সুধীর।
সধবা সুন্দরী তরে, বরষে মুষল ধারে,
পতির প্রণয় সুধা নীর॥
সুরসা পাইল শান্তি, বাড়িল সবার কান্তি,
অশান্তি দ্বিগুণ মোর মনে।
তাই বলি ওরে বর্ষা, আমার সহিত ঈর্ষা,
করিতে কি এলে ধরাসনে?

এ নব সুরসা তরে, যে জন মৃদুল ধারে,
করিবে সুরস বরিষণ।
সে হেন বারিদ হায়, পাব কি এ বসুধায়?
আমার নীরস ধরাসন॥
রে নীরদ নিরদ্বয়! যত দিন বিধবায়,
ভারতে না পায় পতিধন।
বারে বারে দেই কিরে, এ পোড়া ভারতে ফিরে,
করিও না বারি বরিষণ॥

শরত

চৌপদী

শরত আসিল, জগত হাসিল,
আকাশে ভাসিল, নিরমল শশী।
জ্যোতিষ্মতি সতী হয়ে মৌনবতী,
গায় বিভু স্তুতি নিরাতঙ্কে বসি॥
প্রকৃতি কামিনী, যেন রাজরাণী,
সব অভিমানী আদরিণী প্রায়।
হয়ে চারুবেশী, মৃদু মৃদু হাসি,
স্বীয় শোভারাশি ঢালিছে ধরায়॥
হেরে নিশাকর, চকোর নিকর,
প্রফুল্ল অন্তর সদ্য আমোদিত।
নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা,
প্রেমিক প্রেমিকা সবে আনন্দিত॥
রে শরত খল! যে শশী বিমল,
বল মোরে বল কি হেতু আইলি?
এই পাপিনীরে, চির তাপিনীরে,
বিষাদের নীরে কেন ভাসাইলি?
চিরকাল আর,কাল বিধবার—
হয়ে বার বার, আসিও না হায়!
না আসিয়া হেথা, যাও যাও সেথা,
বিধবারা যেথা, পুনঃ পতি পায়॥
হা শারদ শশী! নীলাকাশে বসি,
হাসিয়া সুহাসি, সবারে হাসালে॥
নাগরী নাগরে, হাসে ঘরে, ঘরে,
বিষের সাগরে আমারে ভাসালে॥

তুমি যে পুলকে, পলকে পলকে,
ঝলকে ঝলকে হাসিছ বসিয়া!
না হাসিতে আর যদি একবার,
চিত্ত বিধবার দেখিতে আসিয়া॥
বিধবা হৃদয়, অন্ধকারময়,
আলোকিত নয় হইবে তা আর।
শরত আকাশে, ভারত সকাশে,
শশাঙ্ক বিকাশে ফল কি আমার॥
শরত ব্যাপিয়া, চন্দ্র না শাপিয়া,
কলেমা জপিয়া, বরিয়া সুবর।
তমঃ হৃদয়ের দুঃখ জীবনের,
নাশ, মেহেরের যুক্তি হিতকর॥

হেমন্ত

হইলে শরত শেষ, ধরিয়া রঞ্জিত বেশ,
হেমন্ত আগত মহীতলে।
মৃদুমন্দ সমাগম, তপস্বিনী মনোরম;
হেরে জীব মাতে কুতূহলে॥
আহা কি উত্তাপ হীন, হেমন্ত সুখের দিন,
যামিনী বৈকুণ্ঠ নিকেতন।
সধবা যুবতী যারা, সবে হয়ে কামাতুরা,
করিতে পতিরে আলিঙ্গন॥
বসিয়া পতির পাশ, হাসিছে মধুর হাস,
মন অভিলাষ পুরাইতে॥
সে বিধু মুখের হাসে পতির পরান ভাসে,
তখনি সুরস লহরীতে॥
ক্ষণেতে যুগলময়, অনলে যেমন হয়,
সোনায় সোহাগা বিমিলিত॥
সে হেন স্বর্গীয় ভাব, যাহারা করিল লাভ,
তাদের জীবন সফলিত॥
হায় রে হেমন্ত হিম, তুই তো অপরিসীম,
শীতল করিলে দেহী দলে।
আমার তাপিত মন, জুড়াল না কদাচন,
বরঞ্চ দ্বিগুণতর জ্বলে।

শীত

হেমন্ত অতীত যেই, প্রবল বিক্রমে সেই,
দুরন্ত শীতের সমাগম।
সে মহা শীতের দায়, জীবাত্মা কম্পিত হায়!
পাতালে পলায় ভুজঙ্গম॥
এতো প্রভাবশীল রবি, তাহারো মলিন ছবি,
আকাশে বিকাশ দৃষ্ট হয়।
গভীর জলদ রাজি, তারাও আকাশ ত্যাজি,
সবে আজি হইল বিলয়॥
প্রচণ্ড শিশির নীরে, তরুবর নত শিরে,
সিক্তাঙ্গ হইল নিশাকালে।
প্রাতে হয় অনুমিত, ভুলিয়া ভীষণ শীত,
তারাও ভাসিছে অশ্রু জলে॥
দুরূহ শীতের দায়. সবে করে হায় হায়,
নিশতে শাসিত বসুন্ধরা।
দমিল অনল বল, বরফ জমিল জল,
শাখীরা হইল জীর্ণ জরা।
কিন্তু যে বাসর ঘরে একই শয্যার পরে–
নাগর নাগরী বিরাজিত।
ভুবন বিজয়ী শীত, সে ঘরে যাইতে ভীত–
চকিত কুণ্ঠিত পরাজিত॥
সধবারা মনোল্লাসে প্রিয়ে রেখে বাহু-পাশে
শির দিয়ে একই বালিশে।
শীতেরে উড়ায়ে ফুঁকে, বুকে বুকে মুখে মুখে,
দুয়েতে একাঙ্গ রয় মিশে॥
আমার কপাল পোড়া, সে হেন বুকের ঘোড়া
এ জীবনে জুটিল না আর।
তাই এ বিষম শীতে, বিরহ বেদনা চিতে,
নিশিতে বালিশ বুকে সার॥
শুন হে দুঃখিনীগণ! যদি সে বুকের ধন,
জীবনে বুকেতে চাও ফের।
তবে না ভুলিও আর, ত্বারা তাই কর সার,
বার বার বলে যা মেহের!!

দশম বিলাপ

পোহাল না পোহাল না মম দুঃখ বিভাবরী—
বিন্ধিছে বিরহ বাণ, হায় কি উপায় করি!
যেয়ে ঋতু ফিরে আসে,
ঘরে ফিরে বার মাসে,
"দুঃখ হলে সুখ শেষে" সতত শ্রবণ করি!
আমি তো কপাল ফেরে,
পাতকী নারকী ঘরে,
জননী ভারত-পরে তাই চির দুঃখে মরি!!

তরঙ্গিণীর সন্তানাশা

পতি বিরহের দায়, বার মাস হায় হায়!
কান্দিয়া কাতর তরঙ্গিণী।
হেথায় লইয়া পতি রস রঙ্গে মত্ত সতী
রসবতী সরলা রঙ্গিণী॥
বিধাতার বাসনায়, রস রঙ্গ মহিমায়,
সরলা হইয়া পুত্রবতী।
সুখের নেয়েরে চলে হরিষে করিয়া কোলে,
সে রতন মোহন মূরতী॥
সে রূপ লাবণ্য হেরি, শিরে করাঘাত করি,
ঝোড়ে তরঙ্গিণী পতি হীন।
মুখে বলে হায় হায়! দুঃখে বুক ফেটে যায়,
দুঃখে মোর গেল চিরদিন।[১]
যদি পাইতাম পতি, হইতাম পুত্রবতী
হেরিতাম দুনয়ন খুলে।
সে কাঁচা কোমল মুখে চুম্বিতাম মন সুখে,
বাছা বলে লইতাম কোলে॥
পুরিল না মনোআশ, হাসিয়া মধুর হাস,
মোরে না বলিবে কেহ মা।
মধুময় সুধা রবে কেহ নাই কথা কবে,
আজীবন মনে রবে ঘা॥

---

১. একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া হিন্দু বিধবার স্বহস্ত লিখিত পত্রাংশ দেখুন। যথা—"আমার প্রাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, তাহা আর আপনাকে লিখিয়া কি জানাইব। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ বুঝিবেন না। আমি জন্মাবধি দুঃখ চিনিলাম, কিন্তু সুখ কাহাকে বলে বুঝিলাম না, ঈশ্বর আমাকে কেবল দুঃখের জন্য ভবে পাঠাইয়াছেন, ইহা নিশ্চয়। সে যাহা হোক, আপনাকে বলিয়া কষ্ট দেওয়া মাত্র।" স, বা. দঃ।

সন্তান বিহনে হায়, পরান ফাটিয়া যায়,
সাধ হয় হেরি পুত্র মুখ।
হল তা আকাশ ফুল শুধু নিরাশার শূল,
লাগিছে জুড়িয়া মোর বুক॥
কি দেখালি ও সরলা, জ্বালার উপরে জ্বালা,
জ্বালালি মম হৃদয় বনে।
সহস্র বৃশ্চিক এসে যেমন দংশিছে বসে,
নিমিষে নিমিষে মোর মনে॥
সদা সাধ হয় মনে, পাইলে সন্তান ধনে,
প্রাণ পুরে ভালবাসিতাম।
বারে বারে কোলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে কাঁদায়ে,
হাসায়ে আমিও হাসিতাম॥
আমিও লো তোর মত, শাড়ী ও গহনা কত,
পরিয়া বাছায় কোলে নিয়া।
সখের নেয়েরে এসে মুচুর মুচুর হেসে,
দিতাম মায়ের কোলে গিয়া॥
হেরিয়া নাতির মুখ, সেও দুঃখিনীর বুক,
জুড়াইত আনন্দ সমীরে।
সে চাঁদ কোলেতে লয়ে কত না আদরে যেয়ে,
দেখাত মা নিজ পড়শীরে॥
এই সব আশা লতা, রহিল হৃদয়ে গাঁথা,
গেল বৃথা জীবন আমার।
তাই বলি হিন্দু কুল হয়ে যাক নিরমূল
নিবারুক দুঃখ বিধবার॥
শুন ওগো তরঙ্গিণী, হইয়া নব রঙ্গিনী
যদি পুত্রে হেরিবারে চাও।
কাঙ্গাল কবির কথা, মানিয়া মনের ব্যথা—
নিবারিয়া, বিভু গুণ গাও।

একাদশ বিলাপ

এ পোড়া পরানে মম সহে না তো আর!
রমণী জীবন মম হল রে অসার!!
পুনঃ যদি পেতেম পতি,
হতেম তবে পুত্রবতী,
তা হলে এ দুরগতি, হত না আমার।
হেরে সে কোমল মুখ,
নাশিতাম সকল দুঃখ,
বিদারিত না রে বুক, মম অনিবার!!
খেলার সাথী ছিল যারা,
পুত্রবতী হল তারা,
আমার শুধু অশ্রুধারা হল চির সার!!

তোটক ছন্দ

হায়রে হেরিয়া পরের বাছায়,
সতত পরান বিদরিয়া যায়।
যে দারুণ বিষে দহিছে পরান;
কাহাতে তা বলি, সকলি অজ্ঞান!
এ পাতকী জাতি নিরদয় নলে;
বিধবার দুঃখ বুঝে না কি বলে?
লাজ জ্ঞান যদি থাকিত তাদের;
হৃদয় বেদনা বুঝিত মোদের!
নারকী, পাতকী নীরস হৃদয়;
নরাধম যত পাষণ্ড নির্দয়!
পুত্র আর পতি বিরহের বিষে;
কি যাতনা, তারা বুঝিবে তা কিসে?
এ পোড়া জাতির মুখে দেই ছাই;
ধরম শরম এ জাতির নাই!
বিবাহ যে কি, তা বুঝি না যখন;
কেন বা তা হয়, জানি না তখন!
কামিনীর স্বামী কোন্ কামে হয়;
যখন সে জ্ঞান হয়নি উদয়।
আমি কে, স্বামী কে, বুঝি না যখন,
স্বামীতে আমার কাজ না তখন।
ভয়ঙ্কর কাল মদন ভুজঙ্গে;
যখন দংশন করেনি এ অঙ্গে।
হায়!
সেই যে শৈশবে হতজ্ঞান হয়ে
জ্ঞানহীন পিতা দেন মোরে বিয়ে॥
সহসা আসিয়া করাল শমন।
হরিল বালক পতির জীবন॥
ধুলায় খেলায় ফুরায় শৈশব।
অমনি উথলে যৌবন ভৈরব॥
মহাকাল সম বিশাল মদন।
দংশিল এ দেহে প্রসারী বদন॥
সেই—
হইল আমার প্রয়োজন সব।
অমনি আত্মীয়-স্বজন নীরব॥
পিপাসা কাতরা নাই যে সময়।
মোর তরে জল করিল সঞ্চয়॥

তৃষ্ণাতুরা আমি হইনু যখন।
হারাইল জ্ঞান আত্মীয়-স্বজন॥
ছিল না যখন ঔষধের কাজ।
মোর লাগি তারা আনে বৈদ্যরাজ॥
কিন্তু—
বিষেতে জারিত হইল এ দেহ।
ফিরেও বারেক না তাকায় কেহ।
তাই বলি ছাই এ জাতির মুখে।
আলো কিছু নাই এ জাতির চোখে॥
এ নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ হৃদয়।
হল না এদের কভু জ্ঞানোদয়॥
সময়াসম বুঝিলে কিঞ্চিত।
বুঝি না হতাম সন্তানে বঞ্চিত॥
যদি পিতা, খুড়ো, জ্ঞানশূন্য হয়ে।
শৈশবে আমায় না দিতেন বিয়ে॥
বিয়ে দিলে মোরে যৌবন উদগমে;
হই কি বঞ্চিত স্বামীর সঙ্গমে?
সদ্যই বাসরে করিতেম বাস।
বিবাহ রাত্রেই পুরাতাম আশ॥
নালি ক্ষেত্রে বীজ হলে বিতারিত
থাকিত কদিন বিনা অঙ্কুরিত?
বিগত হইলে দুই চারি মাস।
নিশ্চয় পুরিত পুত্র অভিলাষ॥
তখনেও যদি হারাতেম পতি।
তবে কি সাজি এ অনল মূরতি?
ডাকিত সে বাছা "ও মা ও মা" বলে
তবে এত প্রাণ যাইত না জ্বলে॥
চুম্বিয়া সে ধন করিতাম কোলে।
জুড়াত পরান সে মধুর বোলে॥
ওগো অনাথিনী! তোমার ক্রন্দন।
শুনিবে না তব আত্মীয়-স্বজন।
হীন কবি কয় যদি চাও ত্রাণ।
ত্বরায় কলেমা সুধা কর পান॥
নবীন নাগরী তুমিও যেমন।
নবীন নাগর পাইবে তেমন॥
সাদরে বসিয়া প্রাণের সাগরে।
ডুবিও রসের অতল সাগরে।
সন্তান রতন অবশ্যই তবে।
সরলার মত করগত হবে॥
"অহদাহু" নাম করহ ভজনা।
ঘুচিবে তোমার দুকাল গঞ্জনা॥

বিধবাদিগের যৌবন উপলক্ষে

কবির আক্ষেপ

আজিও শীতল বায়ু ভারতে বহিছে।
কোন কেন বিধবার অন্তর দহিছে?
আজিও বরষে মর্ত্তে সুশীতল নীর।
তবু যে তাপিত অঙ্গ শত কামিনীর?
আজিও আদিত্য নিত্য আকাশে ভাসিছে।
আজিও সুরূপ শশী পুলকে হাসিছে॥
তবে অপ্রভাত নিশি কেন বিধবার।
নিত্য অমানিশা কেন হৃদয়ে তাহার?
আজিও বিশ্বেতে শান্তি দেয় বিশ্বরাজ।
আজিও তারকা শূন্যে করিছে বিরাজ॥
তবে যে অশান্ত কেন বিধবার মন।
তারা হীন কেন তার হৃদয় নয়ন?
আজিও কুসুমরাজি পূর্ণ পরিমল।
গুঞ্জনে ভ্রমর যার লোভে অবিরল॥
তবে কেন অনিবার শুনিবারে পাই।
সে নব ফুটন্ত ফুলে মধুকর নাই।
সে হেন মালঞ্চ অপরূপ শোভাকর।
ফুটিল কমল মালা অতি মনোহর॥
এ হেন কমল যাহা বারেক দর্শনে।
সুধা বরিষণ হয় তাপিতের মনে॥
শশী ও সতেজ রবি রূপে যার হারে।
কবি কি সে রূপ কভু কলপিতে পারে?
রবী শশী আকাশেতে ভাসে নিত্য অই।
কবে কে মোহিত হয়, রূপে তার কই?
এক পুরু বসনেই রবি তেজ হরে।
পলকে মেঘের তলে শশি কর মরে॥
(কিন্তু) যুবতীর বক্ষোদ্যানে পুষ্প বিকশিলে!
বলে কে, লুকায় শত বসনে ঢাকিলে?
সে নব সুবাস পুষ্পে পূর্ণ পরমল।
মদন হিল্লোলে সদা করে টলমল।
রমণী মৃণালে ফুল ফুটিলে যৌবন॥
কভু কি তুলনা তার হয় পদ্ম বন?
আহা সে রতন কেন যতন বিহনে।
চরণে দলিত হয় ভারত কাননে?

যুবার জীবন সেই রতনের খনি।
হয় না তুলনা যার, মুকতা ও মণি॥
তাই বলি আজিও এ বঙ্গ রঙ্গপুরে।
তৃষিত ভ্রমর কত বেড়াইছে ঘুরে॥
তবে এ নলিনী কেন অলি হীনা হায়;
টলিয়া গলিয়া নিত্য লুটিছে ধুলায়?
কবি কয় যার তরে সে ধন সঞ্চিত।
সেই নরাধম তায় যে করে বঞ্চিত॥

সরলা ও তরঙ্গিণীর প্রৌঢ়াবস্থা

সরলা পুনরায় যাইয়া স্বামীর প্রণয় তরঙ্গে সন্তরণ দিয়া বহু সন্তান সন্ততির মাতা ও নিরন্তন তাহাদিগের চন্দ্রানন দর্শনে ইহজীবনেই স্বর্গবাসিনী হইলেন। তরঙ্গিণীর হৃদয়ে সেই এক সুতীক্ষ্ণ বিরহ স্বর, তাহাতে রায় বাঘিনীস্বরূপ ভ্রাতৃজায়াদিগের নিদারুণ গঞ্জনা; সুতরাং সে হতভাগিনীর নারী জীবনটি চিরতরেই নরকবাসে পরিণত। সময়বয়স্কা কুলকামিনী ললনাকুলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সন্দর্শনে তরঙ্গিণী সর্বদা শিরে করাঘাত ও চক্ষু জলে বক্ষ প্লাবিত করতঃ কহিতে লাগিল—"হা নিদারুণ বিধাতঃ! জানি না, কি দোষে এই নরাধম, ধর্মজ্ঞান বিরহিত, মায়া মমতা পরিশূন্য, হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানবিহীন, পাষণ্ড, নিষ্ঠুর কুলাঙ্গার কুলে আমার জন্ম দিলে? হা বিধি! কি দোষে আমায় ঈদৃশ তুষানলে দগ্ধ করিয়া অঙ্গার মূর্তি সাজাইলে? যদি আমি পশু কি পক্ষী হইয়া জন্মিতাম, তা হলেও আমার জনম সার্থক হইত; তা হলেও আমি কোন জীবের উপকারে আসিতাম! হায়! আমার শৈশব-সুখ-স্বপ্নে মিশিয়াছে, অমূল্য যৌবনরত্ন বিজন বনেই ভস্মীভূত হইয়াছে; উপস্থিত কালটিও কেবল নিরন্তন নিরাশার রূঢ় জড়িমাতে পরিণত হইল! হা রে অদৃষ্ট পট! তোমাতে কি এই অনন্ত বিষাদ ছবিই অঙ্কিত ছিল?" বম্প্রকার নানাবিধ কঠোর যন্ত্রণা ভাগ ও ক্রন্দন করিতে করিতে তরঙ্গিণীর প্রৌঢ়াবস্থাও অবসান প্রায়; বৃদ্ধা মাতা ও নিষ্ঠুর পিতা, খুড়ো এবং ভ্রাতা কটিও ক্রমে ক্রমে কালের করাল কবলে চিরকালের তরে শ্মশানবাসী হইলেন; বিধবা ভাই বৌগুলিও স্ব স্ব পিত্রালয়ে গিয়া দ্রৌপদী, কুন্তী ও রাধা ইত্যাদি দেবী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লীলাখেলায় নিযুক্তা হইলেন। তরঙ্গিণীর জরতী জীবনও সমাগতা। এই সময় স্বজনবিহীন বাটী ও আত্মীয়বিহীন সংসারটী তরঙ্গিণীর পক্ষে যে কি বিষদৃশ্য হইল, তাহা চক্ষু কর্ণ এবং বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই সম্যক পরিজ্ঞাত।

সরলা ও তরঙ্গিণীর জরতী ও মৃত্যু

পয়ার

ধনে জনে ভরা সতী সরলা কামিনী।
নির্ধন, বিষণ্ন সদা, জরা তরঙ্গিণী॥
শত সুখে সরলার গত হয় দিন।
দুঃখানলে দহে তরঙ্গিণী পতি হীন॥
সরলার মৃত্যুকাল আসিল যখন।
সত্য নাম শুনাইল তার পুত্রগণ॥
অন্তিম তৃষ্ণায় বক্ষ শুকাইল যবে।
দুগ্ধ জল মুখে তার দেয় পুত্র সবে॥
চরণে কাঁদিয়া সবে "ও মা ও মা" স্বরে–
করিল বিদায় মায় জীবনের তরে।
মরণান্তে সরলার যত পুত্রগণ॥
তখনি সৎকার কার্য করে সমাপন।
তারপরে সানন্দে সবে জননীর তরে॥
দান, ধ্যান, পিন্ডদান সমাপন করে।
(কিন্তু) ধন জন হীন তরঙ্গিণী বুড়ী॥
নিরবল হয়ে সার ধরিয়াছে নড়ী।
পাকিল মাতার কেশ ফুরাইল বল॥
না আছে এমন কেহ দেয় বিন্দু জল।
চলিতে বলিতে ক্রমে শক্তি ফুরায়॥
দুআঁখি হইল ঘোর দেখিতে না পায়।
নাহি পারে ঘাট হতে উদক আনিতে॥
না পারে রাঁধিতে না পারে ভানিতে।
ক্ষুধায় কাতর হয়ে বুড়ী তরঙ্গিণী॥
মুষ্টি অন্ন তরে হয় প্রত্যাশিনী।
চারিদিক নিরখিয়া দেখে অন্ধকার॥
হায় হায় স্বরে বুড়ী কাঁদে অনিবার।
আহা! সেই সময়ে একে ত হুতাশ॥
অন্ন জল বিনা তায় দু'বেলা উপাস।
অনাহারে তরঙ্গিণী শবের সমান॥
সে দুঃখে হেরিলে গলে পাষাণ পরান।
তৃষ্ণায় হইল তার শ্রীকণ্ঠ নীরস॥
কাঁদিতে কাঁদিতে হল সর্বাঙ্গ অবশ।
যেমন নীরদ নীর বিনা চাতকিনী॥
আসন্ন তৃষ্ণায় সেইরূপ তরঙ্গিণী।
ধরায় পড়িয়া বুড়ী করে হায় হায়॥
পর মুখ প্রত্যাশিনী বিন্দু জল দায়।
জল জল বলে তার বিদরে পরান॥
কণ্ঠেতে চাপিল কফ শৈলের সমান।
সে হেন অন্তিম কালে করিয়া ইঙ্গিত॥
গাইল সে অভাগিনী বিষাদ সঙ্গীত।

আসন্ন বিলাপ

চল রে পরান পাখী চল এ পিঞ্জরে ফেলে!
সহিতেছ যাতনা কারে আর আপন বলে?
সহিতেছ কত কাল, তাহে কি পেয়েছ ফল,
বিলম্বে কি ফল বল, বল এ অসমকালে।
ওরে দেহ বলি তোরে, ছিলি মম প্রেম ডোরে
কর হে বিদায় মোরে, যাই নিজ দেশে চলে।
পড়েছি শমন রণে, ফাটে চিত্ত জল বিনে,
দিবে রে কে এ নিদানে, বিন্দু জল মুখে তুলে॥
মৃত্যুকালে, যমানলে পড়ি তরঙ্গিণী,
বলে হায়! নিরুপায়, আমি অভাগিনী।
হায়! হায়! এ সময় ধরি পায় কার?
আমি কার, কে আমার, ভবে আছে আর?
সে যৌবনে, পতি ধনে, যদি পাইতাম;
ভুঞ্জে রতি পুত্রবতী আমি হইতাম।
এই দুঃখে মোর মুখে দিলে বিন্দু জল;
তবে মম এ জনম হইত সফল।
হারে যম, এ বিষয় যাতনা যে আর;
কত্তকাল দিবি বল, মোরে একবার,
দেই কিরে, যাও ফিরে, তুমি ত্বরা করি।
যেয়ে তার অন্ধকার, করে দাও পুরী॥
বিধবার দুঃখে যার হৃদয় দহেনি।
বিধবার বিয়ে যার পরানে সহেনি।
আগে যেয়ে আয় খেয়ে, সবংশে তাহার।
তারপরে নিও হরে, জীবন আমার॥
এই মত অবিরত ঠেকিয়া শমনে।
সে দুঃখিনী একাকিনী দহে ধরাসনে॥
ক্রমাগত হয় গত, বুড়ীর পরান।
অস্ত যায়, রবি তায়, দিবা অবসান॥

সমাপ্ত

উনিশ শতকের নব জাগরণ

ও

তৎকালীন সমাজ চিত্র

(সংকলিত প্রবন্ধ সংযোগিত)

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ-১৪০১

উনিশ শতকের নব জাগরণ
ও
তৎকালীন সমাজ চিত্র

উনিশ শতকের বাংলার এ নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সমসাময়িক রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা এবং নীলকরদের অত্যাচার, দাস-গোলামদের উপর নিপীড়ন, গোলাম বেচাকেনা ও আত্মবিক্রয়ের চিত্র তুলে ধরতে হয়।

আসলে সে সময়ের বাংলাদেশ ছিল মূলত সামাজিক অসঙ্গতি, ধর্মীয় অনাচার, মানসিক ও যৌন বিকৃতি, সহমরণ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ এবং শিক্ষার নামে উৎপীড়ন ও বাবু বাঙালির বাংলাদেশ।

সেদিনকার সামাজিক বিকৃতি ও ক্লেদ ক্লিন্নতার চিত্র পাওয়া যায় সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থগুলোতে। বিশেষত 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস', 'দূতি বিলাস' 'কলিকাতা কমলালয়' এবং মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনে এ চিত্র উজ্জ্বল। প্রতিযোগিতা করে রক্ষিতা ও উপপত্নী রাখা এবং বেশ্যালয় ও পরস্ত্রী গমন বিশেষ নিন্দিত ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনায় আমরা পাই—

"তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেই রূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল! যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয়ে লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্বোপলক্ষে সেথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।"

সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে, আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে—"ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন", এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা, স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোহরেই? দেশের সর্বত্রই এই সম্বন্ধে নীতির অবস্থা শোচনীয় ছিল। অন্যান্য প্রদেশের ত কথাই নাই বঙ্গদেশেও ভদ্রসন্তানেরা প্রকাশ্যভাবে দূষিতচরিত্র নারীগণের সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ করিতেন না।৩

সামাজিক ক্লেদ ক্লিন্নতা ও কদর্যতা এমনি এক পর্যায়ে নেমেছিল যে, রামমোহন দ্বারকানাথও বাইজীদের সঙ্গ সুখে অনীহা প্রকাশ করতেন না।[৪] বাবু বাঙালির আর একটি চমৎকার বর্ণনা পাই—

এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রুপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্‌লস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত; এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।[৫]

ধর্মীয় অনাচার ও কৌলিন্য প্রথার নামে চলত বিকৃতি ও প্রতারণা। নাসাগ্রে প্রাণ এমন কুলিনের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে বাবা-মা কৌলিন্যের জয় ঘোষণা করতো। বিদ্যাসাগরের বর্ণনায়—

বালিকারা তথাকথিত এই কুলীন বৃদ্ধ, অসমর্থ, উপায়হীন ও হীনচরিত্র লোকের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরিশেষে আজীবন পিতৃগৃহে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করে, নাম মাত্রে শ্রুত স্বামিগণ ইহাদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেনা এবং ইহাদের কোন প্রকার সংবাদও লয় না। কিন্তু এইরূপ কিম্বদন্তী সূত্রে শ্রুত অপরিজ্ঞাত স্বামীর মৃত্যুতে ঐ সকল স্ত্রীলোক আইন ও সমাজ-শাসনের ভয়ে বৈধব্য জীবনের সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হয়।[৬]

এ সমস্ত কুলীন প্রতিযোগিতা করে বহু বিবাহ করতেন। বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহ গ্রন্থে আমরা এর একটা তালিকা পাই। তবে বহু বিবাহ করে যিনি কৌলিন্যের শীর্ষে ছিলেন তিনি হচ্ছেন বরিশালের কলসকাঠি গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি ১০৭টি বিবাহ করেছিলেন।

কৌলিন্যের নামে তথাকথিত কুলিনেরা কুৎসিৎ, কদর্য ও অপকর্ম করতে দ্বিধাবোধ করতনা। এরই কিছু চিত্র আমরা পাই—

"এইক্ষণে যে ২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায়...তাঁহাদিগকে নির্গুণ চূড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন ২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন ২ কুলীন জামাতা আপন ২ পত্নীর সহ' শয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আবরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতি সাবধান পূর্বক খুলিয়া পলায়ন করিয়াছেন...কুলীন মহাশয়েরা আপন আপন স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম জানেন যে তাঁহাদিগের

পীড়িতাবস্থাতেও তাঁহাদিগের চিকিৎসা বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন কৌলীন্যের হানিকারক জানেন।" "ধোপা, নাপিত, বৈষ্ণব, মারি, কামলার, কপালির কন্যা", এমন কি মুসলমান কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করাতেও কুলীনদের কৌলীন্য অথবা জাতি ভ্রষ্ট হয় নাই।[৭]

গৌরীদান ও বাল্যবিবাহের চিত্র আরো করুণ, আরো মর্মস্পর্শী। আমরা সে সময়ের সংবাদপত্র হতে একটি চিত্র তুলে ধরছি—

বিধবা বিবাহ। অগ্রহায়ণ ১৭৭৯ শক। ১৭২ সংখ্যা গত ২৮ শে অগ্রহায়ণ শনিবার রজনীতে একটি বিধবা কন্যার পাণি গ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে। এই কন্যার পিতা বর্তমান, তিনি স্বয়ং কন্যাদান করিয়াছেন। শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় বর। শ্রীমতি লক্ষ্মী প্রিয়া দেবী কন্যা। বর সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। কন্যাটি অতি বালিকা, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র। এই বয়সের মধ্যেই তিনি বিবাহ সংস্কার লাভ ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। অতি শিশুকালেই অর্থাৎ দেড় বৎসর বয়সে বিবাহ ও আড়াই বৎসর বয়সে বৈধব্য সংঘটন হইয়াছিল। এরূপ অল্পবয়সে বিবাহ হইলে ঐ বিবাহ প্রকৃত বিবাহ সংস্কার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত কিনা, ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। যাহা হউক দেশাচারানুসারে ঐ বিবাহসংস্কার বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ নামমাত্র বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণেই বরের মৃত্যু হইলে কন্যাও বিধবা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশী বিধবা কন্যাকেও যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে চলিয়া অবলা জাতিকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করা বুদ্ধিজীবী জীবের বিধেয় কিনা এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।[৮]

বিধবা বিবাহ। পৌষ ১৭৭৮ শক। ১৬১ সংখ্যা গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবারে দেশ বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সহিত পলাশডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী ভদ্র বংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীরা বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কন্যার বয়স যখন ৪ বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে ইহার সহিত নবদ্বীপাধিপতি রাজার গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্যের পুত্র হরমাহন ভট্টাচার্যের প্রথমত বিবাহ হইয়াছিল। ঐ বিবাহের ২ বৎসর পরে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়সে ইহার বৈধব্য হয়। এই কন্যা পতিকুলে বাস করিত। ইহার জননী স্বীয় দুহিতার অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণাসহ্য করিতে না পারিয়া আপন আত্মীয়বর্গের সম্মতি অনুসারে তাহার পুণঃপরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীব যত্নশীলা হয়েন।[৯] কৌলিন্যের নামে বহু বিবাহের মাধ্যমে কুলিনেরা যে কদর্য মানসিকতার পরিচয় দিতো এর চিত্র তুলে ধরেছেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের গল্প হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া যাক—

১. অমুক গ্রামে, অমুক নামে, একটি প্রধান কুলীন ছিলেন। তিনি তিন চারটি বিবাহ করেন। অমুক গ্রামে যে বিবাহ হয়, তাহাতে তাহার দুই কন্যা জন্মে। কন্যারা, জন্মাবধি মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মাতুলেরা ভাগেনীয়দের প্রতিপালন করিতেছেন ও যথাকালে বিবাহ দিবেন, এই

করিয়া, পিতা নিশ্চিন্তে থাকিতেন, কোনও কালে তাহাদের কোনও তত্ত্বাবধান করিতেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে, মাতুলদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাঁহারা ভাগিনেয়ীদের বিবাহ কার্য নির্বাহ করিতে পারে নাই। প্রথমা কন্যাটির বয়ঃক্রম ১৮/১৯ বৎসর, দ্বিতীয়টির বয়ঃক্রম ১৫/১৬ বৎসর, এই সময়ে কোনও ব্যক্তি ভুলাইয়া তাহাদিগকে বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

প্রায় একপক্ষ অতীত হইলে, তাহাদের পিতা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন; এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়ের নিকট এই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া, তিনি গলদশ্রুলোচনে, আকুল বচনে, কহিতে লাগিলেন, ভাই এতকালের পর, আমায় কুললক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেন; আর আমার জীবনধারণ বৃথা, আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা কুললক্ষী বাম হইবেন কেন। আত্মীয় কহিলেন, তুমি যে কখনোও কন্যাদের কোনও সংবাদ লও নাই, এ তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে কণ্যাপহারীর শরণাগত হইলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন, আপনি দয়া করিয়া, তিনমাসের জন্যে, কন্যা দুটি দেন; আমি তিন মাসের মধ্যে উহাদিগকে আপনার নিকট পছাইয়া দিব। কণ্যাপহারী তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীন ঠাকুরের কাতরতা দর্শনে ও আর্তবাক্য শ্রবণে অনুকম্পা পরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, তিন মাসের জন্য সেই দু'টি কন্যাটিকে পিতৃহস্তে সমর্পণ করাইলেন। তিনি, চরিতার্থ হইয়া, তাহাদের দুই ভগিনীকে আপন বসতিস্থানে লইয়া গেলেন, এবং এক ব্যক্তি, অঘরে বিবাহ দিবার জন্য, চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, অনেক যত্নে, অনেক কৌশলে, ইহাদের উদ্ধার করিয়াছি, ইহা প্রচার করিয়া দিলেন। কণ্যারা না পলায়ন করিতে পারে, এ জন্য, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সেই রক্ষক, সর্বক্ষণ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কুলীন ঠাকুর, অর্থের সংগ্রহ ও বরের অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত, নির্গত হইলেন; এবং একমাস পরে, ভাদ্র মাসের শেষে, বিবাহের উপযোগী অর্থ সংগ্রহপূর্বক, সে যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর কুললক্ষ্মীর স্নেহে ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। চঞ্চলা বলিয়া লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে; কিন্তু কুলীনের কুললক্ষ্মী সে অপবাদের আস্পদ নহেন।[১০]

(খ) কোনও ব্যক্তি, মধ্যাহ্নকালে, বাটির মধ্যে আহার করিতে গেলেন; দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় দু'টি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর, দ্বিতীয়টির বয়ঃক্রম ১৮/১৯ বৎসর। তাহাদের আকার ও পরিচ্ছদ দুরবস্থার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে; তাহাদের মুখে বিষাদ ও হতাশার সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ইহারা কে, কি জন্যে এখানে বসিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধার দিকে আংগুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি চট্টরাজের স্ত্রী, এবং অল্পবয়স্কাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ইনি তাহার কণ্যা। ইহারা তোমার কাছে, আপনাদের দুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন।

চট্টরাজ দুপুরুষিয়া ভঙ্গকুলীন; ৫/৬ বিবাহ করিয়াছে। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক বৃত্তি পান; এ জন্য, তাহা যথেষ্ট খাতির রাখেন। তাহার ভগিনী, ভাগিনেয়, ও ভাগিনেয়ীরা তাহার বাটিতে থাকেন; তাহার কোনও স্ত্রীকে কেহ কখনও তাহার বাটিতে অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই।

সেই দুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি, আহার বন্ধ করিয়া, তাহাদের উপাখ্যান শুনিতে বসিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন আমি চট্টরাজের ভার্যা; এটি তাহার কণ্যা, আমার গর্ভে জন্মিয়াছে। আমি পিত্রালয়ে থাকিতাম। কিছুদিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা আমি তোমাদের দুজনকে অন্নবস্ত্র দিতে পারিব না। আমি বলিলাম, বাছা বল কি, আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী; তুমি অন্ন না দিলে আমরা কাহার কাছে যাইব। তুমি একজনকে অন্ন দিবে, আর একজন কোথায় যাইবেক; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে। এই কথা শুনিয়া, পুত্র কহিলেন, তুমি মা, তোমায় অন্নবস্ত্র, যেরূপে পারি, দিব; উহার ভার আমি আর লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে বেশ্যা হইতে বল। পুত্র কহিলেন, আমি তাহা জানিনা, তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া, পুত্রের সহিত আমার বিষম মনান্তর ঘটিয়া উঠিল, এবং এক ষষ্ঠিবর্ষীয় বর সমভিব্যবহারে, বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বর, কণ্যাদের চরিত্র বিষয়ে, সমস্তই সর্বিশেষ জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু অগ্রে কোনও অংশে আপত্তি উত্থাপন বা অসম্মতি প্রদর্শন না করিয়া, বিবাহের সময়, উপস্থিত সর্বজন সমক্ষে অম্লাণ মুখে কহিলেন, আমি শুনিলাম এই দুই কণ্যা অতি দুশ্চরিত্রা; আমি ইহাদের পানি গ্রহণ করিব না। কণ্যাকর্তাকে ভয় দেখাইয়া, নিয়মিত দক্ষিণা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রাপ্তিই এই অসম্মতি প্রদর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সামান্যরূপ বাদানুবাদ ও উপরোধ অনুরোধের পর, বর, আর বার টাকা পাইলে বিবাহ করিতে পারেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কণ্যাকর্তা, এক বিঘা, ব্রক্ষত্রভূমি বন্ধক রাখিয়া বার টাকা আনিয়া, বরের হস্তে সমর্পণ করিলেন, শেষ রাত্রিতে, নির্বিবাদে কণ্যাদ্বয়ের সম্প্রদানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কুলীন ঠাকুরের কুলরক্ষা হইল। যাহারা বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কুললক্ষ্মী বিচলিতা হইলেন না, এই আনন্দে ব্রাহ্মণের নয়নযুগলের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাত হইবা মাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলপবালিকারাও অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি, আর কেহ তাহাদের কোনও সংবাদ লইলেন না, এবং সংবাদ লইবার আবশ্যকতাও ছিল না। তাহার পিতার কুলরক্ষা করিয়াছেন, অতপর তাহারা যথেচ্ছাচারিণী বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইলেও ইদানীন্তন কুলীনদিগের কুলধর্ম অনুসারে আর তাহাদের পিতার কুলোচ্ছাদের বা কলঙ্ক ঘটনার আশঙ্কা ছিল না। বিশেষতঃ তিনি কণ্যাপহারীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিন মাসের মধ্যে, কন্যাদিগকে তাহার নিকট পৌছাইয়া দিবেন।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই, প্রতিশ্রুত সময় উত্তীর্ণ প্রায় হয়। এজন্য, সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, উদারচরিত কুলীন ঠাকুর, সেই দুই কণ্যা লইয়া, কণ্যাপহারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই কুলবালিকাদিগকে তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ পূর্বক, তদীয় দয়া ও সৌজন্যের প্রশংসাকীর্ত্তণ ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক, প্রতিশ্রুত সময় মধ্যে, কণ্যা প্রত্যর্পণ প্রতিজ্ঞ হইতে মুক্তিলাভ, ও আনুষঙ্গিক কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়া, প্রসন্ন ও প্রফুল্ল চিত্তে, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অবশেষে, আমায় কণ্যা সহিত বাটী হইতে বাহির হইতে হইল। কিছুদিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম আমার এক মাস্তত ভগিনীর বাটীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে ঐ পাচিকার কর্ম করিব, মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, ২/৪ দিন পূর্বে তাহারা পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন, নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, কি করি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অমুক গ্রামে আমার স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজান সন্তান, চটের কারবার করিয়া, বিলক্ষণ সংগতিসম্পন্ন হইয়াছে; তাহার দয়া ধর্মও আছে। ভাবিলাম, যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয় ভগিনী; কিন্তু তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, সমস্ত কহিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলাম, বাবা, তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই।

আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্নী পুত্র হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলেন, এবং কহিলেন, যতদিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণ পোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে, আমি আহলাদে গদগদ হইলাম। আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি যতোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা সেরূপ নহেন। এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল, এই বলিয়া, তাহারা যার পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে লাগিলেন। সপত্নীপুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন, কিন্তু তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না। একদিন আমি তাহার নিকটে গিয়া সমুদয় বলিলাম। তিনি কহিলেন, মা আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু কোন উপায় দেখিতেছি না। আপনারা কোনও স্থানে গিয়া থাকুন, মাস মাস, আমার নিকট লোক পাঠাইবেন, আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব।

এইরূপে নিরাশ্বাস হইয়া কণ্যা লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্তমান আছেন, তাহার নিকট যাই এবং দুরবস্থা জানাই, যদি তাহার দয়া হয়। এই স্থির করিয়া পাঁচ সাত দিন হইল, এখানে আসিয়াছিলাম। আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে বা অন্নবস্ত্র দিতে পারিব না। অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে কোনও উপায় হইতে পারে, এ জন্য এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।

ঐ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে অতিশয় অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি চট্টরাজের বাটীতে গিয়া যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, আপনার আচরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইয়াছি।

আপনি, কোন বিবেচনায়, তাহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন। আপনি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিবেন কিনা, স্পষ্ট বলুন। ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া, বৃত্তিভোগী চট্টরাজ ভয় পাইলেন, এবং কহিলেন তুমি বাটীতে যাও, আমি বুঝিয়া পরে তোমার নিকট যাইতেছি।

অপরাহ্নকালে, চট্টরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে, মাস মাস, কিছু দিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিতে পারি। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং তিনমাসের দেয় তাহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এইরূপে তিন তিন মাসের টাকা আগামী দিব, এতদ্ভিন্ন, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভার আমার উপরে রহিল। আর কোনও ওজর করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া, চট্টরাজ, স্ত্রী ও কণ্যা লইয়া, গৃহ প্রতিগমন করিলেন।

তিনি নিজে দুঃশীল লোক নহেন। কিন্তু তাহার ভগিনীরা দুর্দান্ত দস্যু, তাহাদের ভয়ে ও তাহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী কন্যাকে পূর্বোক্ত নির্ঘাত জবাব দিয়াছিলেন। বৃত্তিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া ভগিনীরাও অগত্যা সম্মত হইলেন। চট্টরাজ, কখনও কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরা খড়গহস্ত হইয়া উঠিতেন। সেই কারণে, কস্মিনকালেও আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভঙ্গকুলীনদিগের ভগিনী, ও ভাগিনেয়ীরা পরিবার স্থানে পরিগণিত, স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির সহিত তাহাদের কোনও সংস্রব থাকে না।

যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি, পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন, এবং যথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, বাটীতে গিয়া, তিনি সেই দুই হতভাগা নারীর বিষয়ে, অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টরাজ ও তাহার ভগিনীরা স্থির করিয়াছিলেন বৃত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নতুন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইয়াছে, আর তাহা কোন কারণে রহিত হইবার নহে, তদনুসারে, চট্টরাজ, ভগিনীদিগের উপদেশ অনুবর্তী হইয়া, স্ত্রী ও কণ্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহারাও গত্যান্তর গত্যন্তরবিহীন হইয়া, স্থানান্তরে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। কণ্যাটি শুশ্রী ও বয়স্কা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং জননীর সহিত, স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন।[১১]

গল্প দু'টি নামের গল্প হলেও অতীব বাস্তব ঘটনা—বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ আন্দোলনে তথাকথিত কুলীন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসাগরের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন—এ সব আন্দোলন বাস্তবায়ন হলে ধর্ম ও জাতি বিনাশ হবে এবং কৌলিন্য বলতে কিছুই থাকবে না। অথচ সমাজের অন্তঃপুরে দিন দিন কিভাবে ক্লেদ গ্লানি জমেছে এবং কৌলিন্য প্রথা বজায় রাখতে গিয়ে কিভাবে সামাজিক অধঃপতন ও কলঙ্কের পাপ পঙ্ক নিমজ্জিত হচ্ছে এরই জীবন্ত উদাহরণ গল্প দু'টি। কৌলিন্য প্রথার নামে বিবাহ ব্যবসা কিভাবে চলে সেদিকেও বিদ্যাসাগর অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বিদ্যাসাগর আরো দেখিয়েছেন বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ আন্দোলনের ফলে জাতি, ধর্ম ও কৌলিন্য নষ্টের ভয়ে যে সমস্ত কুলীন ব্রাহ্মণদের গাত্রদাহ হয়েছে—তাদের আর সর্বনাশের বাকি কিছুই নেই।

দ্বিতীয় গল্পটির বাস্তবতা ও সত্য ঘটনা সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য—যুক্তি নয়, তর্ক নয়, বাস্তব ও সত্য ঘটনার বিবৃতি। কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না, মিথ্যা বলে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না, কারণ এ ঘটনার সাক্ষীয় স্বয়ং বিদ্যাসাগর, বৃত্তিদাতা ব্যক্তি স্বয়ং তিনি নিজে আর চট্টরাজ তারই বাল্য জীবনের গুরু কালীকান্ত।

উল্লেখিত গল্প দু'টিতে সার্থক ছোটগল্পের প্রস্তুতিভূমি ও সার্থক পরিণতির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। প্রতিটি গল্পেই একটা বিদ্যুৎ চমক আর শেষে যেন কি একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা ও বেদনাবোধের আঘাতে আমাদের হৃদয়ও আর্তনাদে হাহাকার করে ওঠে। এক একটা উপন্যাসের কাহিনীকে যেন বিদ্যাসাগর ছোটগল্পের বাঁধনে ঘনীভূত শিল্পরূপ দিয়েছেন। গল্পগুলোর আবেদন গভীরতর কিন্তু কোথাও বিস্তৃত বর্ণনা আর ব্যাপক পরিধির বিস্তৃতি ও বিধৃতি নেই।

এগুলো জীবনের খণ্ডাংশের মহাব্যাপ্তি আর প্রতিটি গল্পই সমগ্রজীবন ও সমাজকে হৃৎপিণ্ডসহ টান দিয়ে প্রকাণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সমাজের তলদেশের পাপপঙ্কের চিত্রকথা শুধু কৌলিন্যের দর্পে ও রক্ষণশীলতার রাহুগ্রাসে মানব জীবনের কি করুণ পরিণতি ও ট্রাজেডীতে রূপ নেয়, নিষ্পাপ মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়—এবং শেষ পর্যন্ত অধপতনের পঙ্কিলতায় আশ্রয় নিতে হয়—এরই চিত্র আমরা পাই ভবানী চরণের নক্‌সা জাতীয় রচনায় আর প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে—যার বাস্তব ও জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন বিদ্যাসাগর তাঁর গল্পগুলোতে।

গল্প দু'টির পরিণতি ও নিষ্পাপ মানব জীবনের এমনতরো অধপতনে আমাদের অন্তরও একটা তীক্ষ্ণ চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। একটা অসহনীয় ব্যথায় দীর্ণ আত্ম-হাহাকার করে উঠে যখন গল্পের শেষে আমাদের কানে বাজতে থাকে—

'কণ্যাটি সুশ্রী ও বয়স্কা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং জননীর সহিত স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন।'

এ গল্পের আবেদন ব্যক্তিক নয়, সার্বজনীন। বিদ্যাসাগরের এ তীক্ষ্ণ ও তীব্র আক্রমণ কৌলিন্য প্রথা ও সমগ্র সমাজের মুখেই ঝাঁটা নিক্ষেপ করে। 'দু'টি গল্পেই আকস্মিক পরিণতির তীব্র তীক্ষ্ণ মন্তব্য এক সুগভীর ও বিশাল ব্যাপ্ত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতাকে তুচ্ছ করে দিয়ে সার্থক ছোটগল্পের দিকেই যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করে।...এবং একটি মেয়ের স্বচ্ছন্দ দিনপাতের জন্যে দেহ বিক্রয়ের চরম পরিণতি মোপাসাঁর কোন কোন ছোটগল্প পাঠের ফলশ্রুতিতে মনে করিয়ে দেয়।'

অতীব স্বল্প পরিসরে একটা ব্যাপক ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনার বক্তব্যকে উপস্থাপন করাই গল্পগুলোর মৌল উদ্দেশ্য। মানব মনের বিশেষ প্রবৃত্তি ও মনের অবদমিত কামনা বাসনা আর লেখার মানসে বা কোন শৈল্পিক চেতনা হতে এ সমস্ত গল্প তিনি লেখেন নি। তার অসামান্য সাহিত্য প্রতিভার সাথে এসব গল্প লেখার

পেছনে যদি সামান্যতম শিল্প সচেতনতা থাকত তবে হয়ত বাংলা গদ্যের ঊষালগ্নেই আমরা বিদ্যাসাগরের হাতে আধুনিক ছোটগল্পের সার্থক পরিণতি দেখতাম।

জমিদারী পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথ যেমন বিচিত্র জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে ছোটগল্পের অনেক উপকরণ কুড়িয়ে পেয়েছেন এবং সেগুলোকে মানব মনের চিরন্তন আবেদনে সার্থক ছোটগল্পে রূপ দিয়েছেন তেমনি বিদ্যাসাগরও সামাজিক আন্দোলনে বহু বিচিত্র ঘটনার ছিলেন ধ্রুব সাক্ষী—এসমস্ত ঘটনাই ছোটগল্পের উপকরণ হয়ে টুকরো টুকরো রূপে ছড়িয়ে আছে। বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও হৃদয়ের রক্তক্ষরণ নিয়ে এ সমস্ত উপকরণে নিহিত আছে সার্থক ছোটগল্পের বীজ।

সমাজে কৌলিন্য প্রথার বিপর্যয়ে কালে কালে কি কলঙ্ক ডেকে আনে আর এ কলঙ্ককে চাপা দেয়ার জন্য হীনতা ও ধূর্তামির আশ্রয় নেয়া হয় এরই কিছু কিছু ইঙ্গিত রেখেছেন বিদ্যাসাগর চুম্বকধর্মী গল্পে। এমন দু' একটি গল্পের উদাহরণ আমরা তুলে ধরছি—

১. কুলীন মহিলারা নামমাত্র বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায় যাবজ্জীবন, পিত্রালয়ে কালযাপন করেন। স্বামী সহবাস সৌভাগ্য বিধাতা তাহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই। এবং তাহারও সে প্রত্যাশা রাখেন না। কন্যা পক্ষীয়েরা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে কুলীন জামাতা শ্বশুরালয়ে আসিয়া, দু' চারদিন অবস্থিতি করেন, কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ক্রটি হইলে এ জন্মে আর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না। কোনও কারণে কুলীন মহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত, কন্যা পক্ষীয়দিগের ত্রিবিধ বিষয় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, দুই একদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তাহার সহযোগে সম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় জামাতার আনয়নে কৃতকার্য হইতে না পারিলে ব্যাভিচার সহকারী ভ্রূণ হত্যা দেবীর আরাধনা। এ অবস্থায় এ ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, অতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থ ব্যয়ও নাই এবং ভ্রূণ হত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাড়ীর অপর গৃহিণী একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে গিয়া দেখ মা, দেখ বোন অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথা প্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর কাল রাত্রিতে জামাতই আসিয়াছিলেন, হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি না, অনেক বলিলাম, একবেলা থাকিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও, তিনি কিছুতেই রহিলেন না, বলিলেন, আজ কোথাও কোনমতে থাকিতে পারিব না, সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবে, পরে, অমুক দিন অমুকগ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, সেখানেও যাইতে হবে, যদি সুবিধা হয় আসিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর বেলা চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলো, ত্রিপুরাকে ও কামিনীকে ডাকিয়া আন, তারা জামাই-এর সঙ্গে খানিক আমোদ আহলাদ করিবে। এই বলিয়া, সে দুই কণ্যার দিকে চাহিয়া

বলিলেন, এবার জামাই এলে মা তোরা যাস, ইত্যাদি। এইরূপ পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া জামাতার আগমন বার্তা কীর্তন করেন। পরে স্বর্ণ মঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতাকৃত বলিয়া পরিপাক হয়।[১২]

২. বহুকাল স্বামীর মুখ দেখে নাই, তথাপি কোন ও ভঙ্গকুলীনের ভার্যা, ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যাভিচারী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত হইতে হয়, এ জন্য তাহাকে গৃহ হইলে বহিস্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে তাহার হিতৈষী আত্মীয় এই সর্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় না পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ অর্থলোভে চরিতার্থ হইয়া সর্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্ন মঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।[১৩]

কোন কোন গল্পে বিদ্যাসাগর শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতদের অন্তঃসারশূন্যতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তারা প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই রাখতেন না, তাঁরা চালকলাভোজী বঞ্চনা ব্যবসায়ী। শাস্ত্রকে তারা স্বার্থ আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন শাস্ত্রের প্রকৃত বিধান বা ব্যবস্থা নয়—স্বীয় স্বার্থ ও অধিক অর্থ প্রাপ্তির অনুকূলে হলেই যতসব অমানবিক ও নৃসংশতার মধ্যেও তাঁরা শাস্ত্রীয় রায় খুঁজে পেতেন। এ-প্রসঙ্গে একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে—

সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাহার দুই স্ত্রীর পৌত্রদের মধ্যে শ্রাদ্ধাধিকার নিয়ে বিরোধ বাদলে নবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজনাথের কিঞ্চিত অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। মৃত জমিদারের গুরু প্রখ্যাত পণ্ডিত জানকী জীবন ন্যায় রত্নের ব্যবস্থানুযায়ী এক পত্নীর উপনীত পৌত্র শ্রাদ্ধ কার্য সম্পন্ন করলে, অন্য পত্নীর অনুপনীত পৌত্রেরা ঘুষ দিয়ে ব্রজনাথের বিধান আদায় করে আবার শ্রাদ্ধ করলেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের হ'য়ে বিদ্যাসাগরের সম্মতি আদায় করতে এসে ব্রজনাথ নিজেরমুখেই অম্লানবদনে স্বীকার করলেন যে, প্রথম শ্রাদ্ধের বৈধতার ব্যবস্থাপত্রে তিনিও ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরকারী। হতবাক বিদ্যাসাগরের বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরো জানালেন যে, ব্যবস্থা দেবার সময় 'বচন কচন' দেখার সময় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রধান সমাজ নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত পরম মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা দেন না, যে বেশী টাকা দেয় তার পক্ষেই তিনি ব্যবস্থা দেন, আরো বেশী টাকা পেলে অবলীলাক্রমে নিজের পূর্ব প্রদত্ত বিধির প্রতিবাদ করেন নতুন ব্যবস্থা দেন। চালকলাভোজী বঞ্চনা ব্যবসায়ী এ সমস্ত অন্তসারশূন্য শাস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন নিম্নের গল্প দু'টিতে।

শুধু তাই নয় একদিকে ব্যঙ্গ অপরদিকে কথ্যরীতিতে গল্প বলার সহজ ও সরল ঢঙটি যে তাঁর কাছে কত অনায়াসে ও সহজলব্ধ ছিল নিম্নের দু'টি গল্পই এর সাক্ষ্য বহন করে।

১. এক গ্রামে দুই বিদ্যাবাগীশ বুড়া ছিলেন। ইহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক, কনিষ্ঠ স্মার্ত। একদিন, একব্যক্তি ব্যবস্থা জানিতে গিয়াছিলেন। স্মার্ত বিদ্যাবাগীশ বাড়ীতে নাই শুনিয়া, তিনি, যাইতেছেন দেখিয়া নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য আসিয়াছ। তিনি কহিলেন, আমার একটি তিন বৎসরের দৌহিত্র মরিয়াছে; তাহাকে পুতিব না পুড়াইব, ইহার ব্যবস্থা জানিতে আসিয়াছি। নৈয়ায়িক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, তাহাকে পুতিয়া ফেল। সে ব্যক্তি জানিতেন তিন বৎসরের ছেলেকে পোড়াইতে হয়, পুতিতে হয় না; তথাপি, সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে, পুঁতিতে হইবে শুনিয়া তিনি সন্দিগ্ধ মনে ফিরিয়া যাইতেছেন; এমন সময় পথিমধ্যে, স্মার্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসিলেন, পুঁতিব না পোড়াইব। তিনি পোড়াইতে বলিলেন। তখন সে ব্যক্তি কহিলেন, তবে বড় মহাশয় পুঁতিতে বলিলেন কেন? স্মাতু, জ্যেষ্ঠের মান রক্ষার জন্য কহিলেন, তিনি পরিহাস করিয়াছেন। অনন্তর তিনি বাটীতে গিয়া জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, কি বুঝিয়া আপনি এরূপ ব্যবস্থা দিলেন; পুড়াইবার স্থলে পুঁতিতে বলা অতি অন্যায় হইয়াছে। নৈয়ায়িক কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচনা করিয়াই পুঁতিতে বলিয়াছি। পুঁতিয়া রাখিরে, যদি পোড়াইবার দরকার হয়, তুলিয়া পোড়াইতে পারিবেক, কিন্তু যদি পোড়াইতে বলিতাম, তখন পোড়াইয়া ফেলিলে, যদি পুঁতিবার দরকার হইত তখন কোথায় পাইবে।[১৪]

২. কিছুকাল পূর্বে, এই পরম পবিত্র গৌড় দেশে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাহারা তাহার কথা শুনিতেন সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্য বয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া এমন মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে সন্ধ্যার পর, তাহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া অবশেষে ঐ বিধবা রমণী গুণমনি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

একদিন শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতির ব্যাভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষকীর্ত্তন করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছিলেন—

যে নারী পরপুরুষের উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে অনন্তকাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলীবৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধদেশে অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা ব্যভিচারিণীকে, ঐ ভয়ঙ্কর শাল্মলীবৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া বলে, তুমি জীবদ্দশায়, প্রাণাধিক প্রিয় উপপতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে, যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান করিতে, এক্ষণে এই শাল্মলীবৃক্ষকে উপপতি ভাবিয়া, সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন দান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে যমদূতেরা, যথাবিহিত প্রহার ও তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করায়; তাহার সর্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, শোণিতস্রাব হইতে থাকে; সে যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতি করুণ স্বরে বিলাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, কোনও স্ত্রীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের অভিলাষে পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে,—ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তি ভোগ বৃত্তান্ত শ্রবণে, কথক চূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই; অতঃপর আর আমি প্রান্নান্তেও পরপুরুষে উপগতা হইব না।' সেদিন সন্ধ্যার পর, তিনি পূর্ব্ববৎ, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্য্যা করিলেন; কিন্তু অন্যান্য দিবসের মত, তাহার চরণ সেবার জন্য, যথাসময়ে তদীয় শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন, অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে অধৈর্য হইয়া তাহার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গলদশ্রুলোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো; কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। সিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি। আপনার চরণ সেবা করিতে আর আমার কোনও মতে প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছেন না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।

সেবাদাসীর কথা শুনিয়া পণ্ডিত চূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং দ্বারদেশে আসিয়া সেবাদাসীর হস্ত ধরিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন আরে পাগলি! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না? আমরা পূর্ব্বাপর যে রূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেরূপ বলিয়াছি। শিমুল গাছ পূর্ব্বে ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল বটে, কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, শিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে। এখন আলিঙ্গন করিলে, সর্ব্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়। এই বলিয়া অভয়দান ও প্রলোভন পূর্ব্বক শয্যায় লইয়া গিয়া গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাহাকে পূর্ব্ববৎ চরণ সেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।[১৫]

কুলিনদের এসবই কদাচারের চিত্র 'সমাচার সুধাবর্ষণ থেকে আরো কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি—

কুলিনের ব্যবহার। ২৭.৪.১৮৫৫

এক আশ্চর্য্য কোন কুলিন ঠাকুর অনেকগুলীন বিবাহ করিয়া প্রাচীন হইয়াছেন। কোনখানেই আর পূর্ব্ববৎ সমাদর পান না, এবং সেইরূপ সুখে আর দিনপাত হয় না। লোকের মুখে শুনিলেন যে, কাজলা-কাষ্ট-কুড়ম্ব গ্রামে যে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই পক্ষের একটি সন্তান অতিশয় কৃতী হইয়া বিলক্ষণ ষোত্র করিয়াছেন, নাম সম্ভ্রম করিয়াছেন। ভাল রূপ বাড়ী ঘর করিয়া ক্রিয়াকৰ্ম্ম করিতেছেন। ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইয়া সেইস্থানে গমন করত পুত্রের নিকট আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। কৃতীপুত্র আপনার পিতাকে পাইয়া অতিশয় সম্মান করিলেন। উত্তম ঘর, উত্তম শয্যা, উত্তম-বস্ত্র সহযোগে আহারাদির বিষয়ে অতি উত্তম নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন ব্রাহ্মণ শেষ অবস্থায় অত্যন্ত সুখী হইয়া তথায় বাস করেন, এমন সময়ে এক ঘটনা হইল, পুত্রটি "বিশ্বকর্ম্মার ব্যাটা বিয়াল্লিসকৰ্ম্মা" হইতে পারেন নাই, সবেমাত্র ১০/১২টি বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে "দামুড় হুদো-মামুদপুর" গ্রামের শ্বশুর এক পত্র পাঠাইলেন যথা।

"পরম কল্যাণীয়",

শ্রীযুত—মুখোপাধ্যায় বাবাজী পরম কল্যাণবরেষু।

"২৬ অগ্রহায়ণ বুধবার দিবসে তোমার এক নবকুমার হইয়াছে, ৮ বৈশাখ শনিবার দিবসে তাহার অন্নপ্রাসনের দিন ধার্য্য করা হইয়াছে বাবাজী তুমি পত্র পাঠ এখানকার বাটীতে আগমন করত : শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবা, আমি সমুদয় আয়োজন করিয়াছি ইতি।"

উক্ত বাবুজী এই পত্রখানি পাঠ করতঃ তৎক্ষণাৎ অমনি আড়ষ্ট হইলেন, পরে আস্তে ব্যস্তে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট আসিয়া কহিলেন "বাবা, বাবা! হ্যাদে এক চমৎকার দেখো, দুই বৎসর হইল আমি অমুক স্থানের শ্বশুর বাড়ী গমন করি নাই, সে স্ত্রীকেও এখানে আনি নাই, আমার শ্বশুর এই পত্র লিখিয়াছেন, অমুক দিবস তোমার ছেলের ভাত হইবে, তুমি পত্র পাঠ এখানে আসিবে।"

এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক বৃদ্ধটি তখনি অম্লান বদনে কহিতেছেন "হা: হা: বাবা, হা: তার ভাবনা কি, কুলীনের ছেলে, চিন্তা কি, অমন হোয়ে থাকে, হোয়ে থাকে, কি বাবা তার আটক কি, তুমি এখনি যাবে, আমি সব উদ্যোগ করিয়া দিই, এতো বড় ভারি নহে, তুমি ভাতের সময় সংবাদ পাইলে, এই যে বাবু, তুমি হইলে পর একেবারে তোমার পৈতার সময় আমি পত্র পাইয়াছিলাম আমি তাহাতে কিছুই মনে করি নাই, স্বচ্ছন্দে এখানে আসিয়া তোমার পৈতা দিলাম। কুলীনের কি ওদিকে শ্বশুর যেমন কসুর করেন না, এদিকে তেমনি জামাই হইয়া কামাই উচিৎ হয় না।[১৬]

বিধবা-বিবাহ

(প্রেরিত পত্র) ১০.৭.১৮৫৫

শিলা জলে ভাসে শাখা মৃগে গীত গায়।
বিধবার পরিণয় শুনে হাসি পায়॥
পণ্ডিতে ব্যবস্থা দিবে মনঃ বিচারিয়া।
ছিল সবে সেই আশা পথ নিরখিয়া॥
নৃপতি ভবনে তর্কবাগীশের মেলা।
পরাস্ত হইল সবে মীমাংসার বেলা॥
কেহ বলে আছে পাতি নাহি ব্যবহার।
বিনা পুরাবৃত্ত দৃষ্টি সকলি আসার॥
যে লিপি আছয়ে তাহা অন্ত্যজের পক্ষে।
শুনে সে বৃত্তান্ত আহা ধারা বহে চক্ষে॥
অক্ষত যোনির ছিল নিতান্ত বিশ্বাস।
বিতর্ক ভাঙ্গিয়া দিল আশ্বাস প্রশ্বাস॥
পতিসহ ছিল ভাল পিতা আহরণ।
হইত সমূলে যত জ্বালা নিবারণ॥
কান্তের বিয়োগে কান্তা বৈধব্য দশায়।

ঝরে আঁখি অহরহ ভাব্য ভাবনায়॥
ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পদে নমস্কার।
অবলা সরলা ভাগ্যের তপস্যা আচার॥
প্রাতে উঠি তাড়াতাড়ি সারি গঙ্গাস্নান।
শিবলিঙ্গ পূজা সন্ধ্যা বন্দনা বিধান॥
হরিনাম জপ সাঙ্গ মালা ফিরাইয়া।
যথাকালে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া॥
মুখশুদ্ধি হরীতকী আছে নিরূপণ।
প্রতি একাদশী যোগে ব্রত অনশন॥
এতদ্ভিন্ন বার তিথি পর্ব্ব উপলক্ষে।
উপবাস উপহার বিধবার পক্ষে॥
প্রগাঢ় কঠোরে দিনগত পাপক্ষয়।
সেই পারে যার আছে লোকনিন্দা ভয়॥
নতুবা অশেষ দোষ ঘটে বিধবায়।
স্বভাব চর্চ্চিয়া লোকে দোষ গুণ গায়॥
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় জয় করে সাধ্য কার।
বিশেষে যৌবনকালে নাহি পারাবার॥
সদাচারে কায়মনো সমর্পণ করি।
দৈহিক বাঞ্ছিত সুখ সাধ পরিহরি॥
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি প্রায় বিধির সৃজন।
বিচারিয়া দেখ সব বৈধব্য লক্ষণ॥
রসনা করিতে নারে সুস্বাদু গ্রহণ।
অঙ্গে নাহি উঠে কভু রত্ন আভরণ॥
কাটিতে পরিতে নারে বিচিত্র বসন।
ইচ্ছামত নাহি হয় চর্ব্বণ ভক্ষণ॥
চিকন চিকুর জালে তৈল বিবর্জিত।
পুরুষ সঙ্গম ইচ্ছা বিধি অবিহিত॥
ক্ষেত্র সত্ত লোপাপত্তি ফল উৎপাদন।
এই তো সৃষ্টির হ্রাস দেখি প্রকরণ॥
পরাশর মুখ নির্গলিত উপদেশ।
লিপিযোগে প্রচারিল স্বদেশ বিদেশ॥
বিধবা রবে না কলিযুগে ধরাতলে।
ভগবানদত্ত বিধি সংহিতায় বলে॥
শ্রবণে প্রফুল্ল মনে ইয়ং বেঙ্গাল।
ভাবিলেক অবলার ঘুচিল জঞ্জাল॥
কেহ বলে আহা মরি তনয়া উহার।
কৈশোর বয়সে ইকি কঠিন আচার॥
অমুকের সঙ্গে কর উদ্বাহ সম্বন্ধ।
উভয়ে হইবে সুখী বাড়িবে আনন্দ॥

এইমত স্থানে ২ শুনি কানাকানি।
কেহ ধন্যবাদ দেয় ব্যবস্থা বাখানি॥
কেহ চির আইবুড় বিনা অর্থযোগে।
কেহ বা অসুস্থ সদা গৃহশূন্য যোগে॥
দিন ২ তনু ক্ষীণ নাহি পরিমাণ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সদা বিগত বিজ্ঞান॥

হুতাশে হুতাশ চিত্ত ধরিয়াছে টান।
ক্ষুধা নিদ্রা বিবর্জিত কণ্ঠাগত প্রাণ॥
নশ্বর দৈহিক ঘটে সুখে গজ মন :।
রোগী আশ্বাসিয়া কহে সুহৃদ বচন॥
স্বর্গসম সুখভোগ প্রমদা মিলনে।
সে ভোগ বিয়োগ আহ প্রিয়ের নিধনে॥
পুনঃদার পরিগ্রহে হলে কৃতদার।
পাইবে আসল শান্তি হবে প্রতীকার॥
একাদশ বৃহস্পতি তা সভার পক্ষে।
বয়স্থা বিধবা নারী নিরখি স্বচক্ষে॥
সাদরে বিবাহ সারি হবে কৃতদার।
সমুজ্জ্বল করি গৃহ পাতিবে সংসার॥
এই তো আশ্বসে সিন্নি মানে সত্যপীরে।
বিয়ে জপমালা করে দ্বার ২ ফিরে॥
তাদের কপালে ছাই পড়িল এখন।
বিধবা বিবাহ প্রথা হলো না চলন॥
ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি যতেক বুধগণ।
বিচারে ব্যবস্থা খণ্ড করিল খণ্ডন॥
বিশ্ববিভু প্রজাপতি পদে নমস্কার॥
হয় হবে হইতেছে ইচ্ছায় যাহার।
বিধবা বিবাহ কল্পে নিদ্রিত আতঙ্কে॥
কে তারে চিয়াতে পারে অবৈধ প্রসঙ্গে।
সাগর মন্থিলা সুধা লভিবার আশে॥
ইয়ং বেঙ্গাল যত পড়িল নিরাশে।
বেঁচে গেল কতিপয় নন্দের দুলাল॥
প্রেমভাঙ্গা প্রেমরস সুস্বাদু রসাল।
নিত্য ২ পান করে নিষ্করে গোপনে॥
এ বৃত্তি হইতে ছেদ প্রথা প্রচলনে—১৭

কস্যচিৎ জনস্য

এবার আমরা উপরে উল্লেখিত বিষয়ের কিছু কিছু চিত্র তুলে ধরছি—

ধর্মীয় নিষ্ঠুরতা

নরবলি ঃ ... "অতি নিকটবর্তী বর্দ্ধমান জিলাতে মধ্যে মধ্যে নরবলি হওন-বিষয়ক জনশ্রুতি দেশময় প্রচার হইয়াছে...সর্ব্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার বর্দ্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং ঐ বংশের মধ্যে যখন কোন ভারি অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানের আবশ্যক বোধ করেন। সম্প্রতি ঐ বংশের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসন্তরোগ হওয়াতে নরবলিদান হইয়াছিল এমন জনশ্রুতি আছে।

সহমরণ ঃ 'নরবলি' গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ ও রথের চাকার নীচে গাত্র চালান পূর্ব্ব ছিল তাহা হইতে ভয়ানক সহমরণ অনুমরণ ভদ্রলোকের দর্শনে বোধ হয় কারণ, অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রোপদেশদ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এরূপ উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত করণ সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঘূর্ণপাকে ৬বার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ়বন্ধন পুনঃসরে জলদগ্নিতে দুগ্ধ করণ ও বংশদ্বয় শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কে না শুনিতে পায় এ নিমিত্ত গোলমাল ধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্ম্মায়িত মনুষ্যের কর্ম্ম...

অন্তর্জলি ঃ "গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া রোগী ব্যক্তিকে যা ইচ্ছা তাই একটা খড়ুয়া ঘরে রাখে তাহাতে দিবার রৌদ্র রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এই স্থানে দুই এক দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে হয়...পরে তাহাকে ঐরূপ ঘর হইতে উঠাইয়া প্রবাহসমীপে লইয়া অর্দ্ধ শরীর জলমগ্ন করিয়া অর্দ্ধ রৌদ্রের তাপে আর্দ্রভূমিতে রাখে অনন্তর দুই একজন আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেলিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা লেপন করিয়া হরিবোল ২ বলত কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল মুখে দেয়...রোগীর চীৎকারে কেহই মনযোগ করে না এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে যখন জোয়ার আসিয়া রোগীর কোমর পর্য্যন্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ টানিয়া লইতে থাকে এইরূপ টানাটানি করাত কখন কখন তাহার শরীরের কোন স্থানে আঘাত হয়...কখন ২ তাদৃশ যাতনা না দিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে...পুণর্বার লইয়া গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতি শীঘ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়া দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায়।"

ধর্মীয় বিকৃতি ঃ "যদ্যপি নীচু কুলোদ্ভব ব্যক্তি বৈষ্ণব হয় তবে তাহাকে বিষ্ণু পরায়ণ বলিয়া তাহার চরণামৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন। কিবা প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা যে ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি অদ্য মদ্যপানাভিভূত ধুল্যবলুণ্ঠিত থাকে আর কল্য প্রভুর দ্বারে ১/০ পাঁচ সিকা নিঃক্ষেপ করত ভেকাশ্রমী হইলে অতিশয় মান্য হন।"[১৮]

সমাজের এই অসংগতি ও মানস বিকৃতি এবং ক্লেদ ক্লিন্নতায় যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা আমাদের কাছে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। তখন মহেশের রথের উৎসবের সময় জুয়া খেলায় হেরে স্ত্রী বিক্রয় ছিল একটি স্বাভাবিক ঘটনা। আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৩০ সনে নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বানরের বিবাহে এক লক্ষ টাকার খরচ করে সেকালে সবচেয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তি হয়েছিলেন।

সমাজের অভিজাতরাও এসবই মানসিক ও রুচি বিকৃতি থেকে মুক্ত ছিলেন না। দ্বারকানাথ ঠাকুর নতুন বাড়িতে প্রবেশের সময় যে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করে এতে কৌতুক ও ভাঁড়ামী অবর্ণনীয় স্থূলতায় পৌছে। সেখানে একজন ভাঁড় বলদ সেজে সত্যিসত্যিই ঘাস খেয়েছিল।

এবার 'বাবু বাঙালি' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। মিথ্যা, জাল, জুয়া-খেলা, ঘুষ গ্রহণ, বহু পত্নী ও উপপত্নী রাখা সমাজে গর্ব ও প্রশংসার বিষয় ছিল। বাজি ধরে ঘুড়ি উড়িয়ে সম্পত্তি হারিয়ে দেউলিয়ে হওয়া এবং স্ত্রী বন্ধক রেখে ও স্ত্রী বিক্রি করে জুয়া খেলা তেমন অসম্মানের বিষয় ছিল না। বুলবুলি আর পায়রার লড়াইয়ে যে বেশি ব্যয় করত সে সমাজে আভিজাত্যের আসন পেত।

আমোদ প্রমোদ ও বিনোদনের প্রধান বিষয় ছিল অশ্লীল ও আদি রসাত্মক কবিগান, পাঁচালী, আখড়াই ও তরজা প্রভৃতি। এ সমাজেরই প্রতিভূ ছিল সেদিনকার অর্ধ শিক্ষিত ও অমার্জিত বাবু বাঙালিরা। শিবনাথ শাস্ত্রী তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—"বাইজী ও পতিতারা সেদিন উচ্চশিক্ষিত সমাজেও প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং প্রচণ্ড আলোড়নও তুলেছিল। সেদিনকার শ্রেষ্ঠ দুজন বাঙ্গালীর জীবনেও বাইজী যে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এর একটা নজীর তুলে ধরছি—'নিকি' নামে এক বাইজীকে নিয়ে ধনীদের মধ্যে কি তীব্র প্রতিযোগিতা! এ 'নিকি' বাইজীকে মাসিক একহাজার টাকা মাসহারা দিয়ে রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করে কলকাতার এক ধনী ব্যক্তি সবচেয়ে বিস্ময় ও আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং প্রশংসা ও গৌরব অর্জন করে কলকাতার শ্রেষ্ঠ আভিজাত্যের আসন দখল করেছিল। স্বয়ং রামমোহন রায় এ 'নিকি' বাইজীর সঙ্গসুখে তৃপ্তি পেতেন এবং তার বাড়িতে নৃত্যগীত উপভোগ করে কৃতার্থ হতেন। রামমোহন রায়েরও সেখানে বহুবার যাতায়াতের নিদর্শন আছে। এমন কি প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুরও এ কুরুচি, অশ্লীল ও মানস-বৈকল্য পরিবেশে নিকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদ ভোগ থেকে মোটেই বঞ্চিত ছিলেন না। পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য উৎসবে আড্ডা-আখড়া ও পথে পথে প্রায় উলঙ্গ হয়ে, মদ ও গাঁজা খেয়ে আদি রসাত্মক কুৎসিত নৃত্য ও গান ছিলো বাবু সমাজের মানসরুচির পরিচয়।[১৯]

কোলকাতার এক ধনী ব্যক্তি নিকি বাইজীকে প্রতিমাসে একহাজার টাকা করে মাসহারা দিয়ে তাকে রক্ষিতা হিসেবে রেখে সমাজে পদস্থ ব্যক্তির আসন পেয়েছিলেন।

এসবই বাবুদের নিয়ে অনেক কবিতা ও নাটক-প্রহসন লেখা হয়েছে। 'নববাবু বিলাসে' বাবুর লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোষাকী যশসী দান,
আড়ি ঘুড়ি কানন ভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

ছদ্মবেশী কবি 'বৈতালিকের' 'বাবু' নামক কবিতাটির কয়েকটি চরণ এখানে তুলে ধরছি—

ফকীর হইব তবু কি ছাড়িব,
ভিক্ষাতেও বাবুগিরি চালাইব।
যশের পতাকা তুলিয়া ধরিব,
উড়িয়ে বাতাসে শন্ শন্ শন্।

১৭৭৮ সালে "বেঙ্গলী ম্যাগাজিন" পত্রিকায় 'হিন্দুস্থানী' ছদ্মনামধারীর লিখিত 'বেঙ্গলী বাবু' নামক প্রবন্ধে বাবুর আটটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, নিম্নে এর ভাবানুবাদ দেয়া হল—

১. বাবুরা বিশেষত ঋজু ও দুর্বল দেহভারী, করুণ হৃদয়বান এবং আবেগপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়।

২. বাবুরা পোষাক ও চালচলনে বিশেষ উন্নত ধরনের হবে, কিন্তু লেখাপড়ায় নয়। একটা নির্দিষ্ট সংগঠিত কিছুতে সব সময়ই অনীহা প্রকাশ করবে।

৩. বাবুরা প্রচলিত বিশেষ কতকগুলো খারাপ অভ্যাসে আসক্ত থাকবে এবং বৈচিত্র্য ও সৃষ্টিশীলতার অভাব তাদের মধ্যে দেখা যাবে।

৪. বাবুরা আচার-ব্যবহার, রুচি ও মন-মানসিকতায় দেশীয় ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও পোষাক এবং রীতিনীতির প্রতি একান্তভাবে বিরূপ থাকবে।

৫. নিজেদের আভিজাত্য নিয়ে খুব গর্ব ও অহঙ্কার করবে। তারা উষ্ণ মেজাজ ও মন্দ-প্রকৃতির হবে এবং রুক্ষ আচরণ করবে।

৬. তারা মাতৃভাষার প্রতি বিরাগ হবে, ইংরেজি বুলি আওড়াবে এবং দেশীয় ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও পূজা-পার্বণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করবে।

৭. তারা সরকারের অনুগত এবং প্রজাপীড়ক হবে।

৮. মদ, জুয়া ও বিলাসিতা এবং পতিতা ও রক্ষিতা সঙ্গসুখে দিন কাটাবে।

সেদিনকার অনেক প্রহসনেও বাবুর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে; যেমন, প্রিয়নাথ পালিতের "টাইটেল দর্পণ" প্রহসনে আছে—

শুধু বাবু হয় নাই; আটটি লক্ষণ চাই,
তবে নাম জানিবে সকলে!
বেশ্যাবাড়ি ছড়ি ঘড়ি, বিকেলে ফিটন গাড়ি
দিবানিশি ভাস লাল জলে।
গানবাদ্য কর সার, মাছ ধর রবিবার,
চুল কাট আলবার্ট ফ্যাসানে।
বড় লোক বলি তবে ঘুষিবে সুখ্যাতি সবে
সার কথা দীনবন্ধু ভণে।

বাবু শব্দের বুৎপত্তি নিয়েও সেদিন হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে ব্যাঙ্গাত্মক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১২৮১ সালে আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় "বান্ধব" পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাবুর বুৎপত্তিবাদ' নামক একটি প্রবন্ধ হতে একটু উদ্ধৃত দিচ্ছি, "বাবু—ভব চাঞ্চল্য, বৃথাভিমানে, পরাণুকরণে, ধৃষ্ট ব্যবহারে চ। ঔনাদিকে নুঃ প্রতয়:। ন 'ণ' ইৎ যায়, উ থাকে, আকারে বৃদ্ধি যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান গগনস্পর্শী, চিত্ত পরাণুকরণরত এবং ব্যবহার ধৃষ্ট, তাহারা বাবু। বাবু চাঞ্চল্যে ভ্রমর সদৃশ্য, চিন্তাশক্তি কিছুতেই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না, অভিমানে শরতের মেঘ গর্জে, কিন্তু বর্ষে না, অথবা বর্ষার ভেক, নিয়ত শব্দ করে কিন্তু নিকটে আসিতে সাহস পায় না, পরদেশীয় ছন্দানুবর্তনে সর্বথা নিগারদের সমান, একবার আসবাব ও পোষাকের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এবং ধৃষ্টতায় প্রুশিয়ানদিগের প্রপিতামহ, কথায় বোধ হয় এক লম্ফে সপ্ত সাগর উল্লঙ্ঘণ করাও বিচিত্র নহে।"[২০]

১৮৮০ সালের "মধ্যস্থ" পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় বাবুর যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে নিম্নে তা তুলে ধরলাম—

১. ইংরেজি স্কুল বা ইংরেজি প্রণালীর বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িতে হইবে। কতকাল বা কতদূর পড়া—তাহার নিশ্চয়তা নাই। দিন কতক বা পাতাকতক পড়িলেই যথেষ্ট।

২. ইংরেজি বুলি কতগুলি পাকা ধরণে, বাঁকা টোনে ও একেলে উচ্চারণে (অশুদ্ধ বাংলার সহিত ভাঁজাল দেওনার্থ) অভ্যাস করা চাই।

৩. তোমার বিষয়-আশয় যেমন তেমন হউক, ইংরাজি জুতা, পীড়ান, চিনাকোট, ফিরানো চুল, পায় হাফ মোজা, হাতে ষ্টিক একটা চাইই চাই। আর যদি উচ্চধরনের সাহেব বাবু হইতে সাধ থাকে, তবে জ্যাকেট পেন্টুলেন, চেনঘড়ি, নাকে চমশা, চাপ দাড়ী, চুরোট, শীশ, কুকুর, ড্যাম হুট্ ইত্যাদি প্রকরণের প্রয়োজন।

৪. ঘাড় নাড়িয়া সম্ভাষণ, সেক হ্যাণ্ড, নমস্কার-প্রণামে ঘৃণা বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরোক্ষ বা সমক্ষেও উপহাস, ভিক্ষুককে অনাদর, খবরের কাগজে আদর, রাজ্যের আগ্রহ, সভা-টভার নামে রোমাঞ্চ, দলাদলির নামে খড়গহস্ত, কথায় কথায় স্বাস্থ্যরক্ষার উল্লেখ, সর্বদাই অস্বাস্থ্যের অভিযোগ, আহারের দিন দিন স্বল্পতা, পদব্রজে গমনের ক্লেশজ্ঞাপন, এসব নইলে নয়।

৫. পুরোহিতের পুত্র হও তো পূজা ত্যাগ, অধ্যাপকের হও তো সংস্কৃত পড়া ত্যাগ, কায়স্থ হও তো ঘরে রাধুনী রাখা বা সঙ্গতি অভাবে মা বোনকে দিয়ে সে কাজ সারা, তাঁকে হাড়ি ছুতে না দেওয়া, দোকানীর পুত্র হও তো দোকানের সীমায় লজ্জায় না যাওয়া, ময়রার পুত্র হও তো, তাড়ু ছাড়া, নাপিতের পুত্র হও তো ভাঁড় জলে ফেলা, কলুর হও তো ধান গাছ পুতে ফেলা, চাষার হও তো হাঁস গরু বিলিয়ে দেওয়া—দেনা থাকলে বেঁচে ফেলা! এ সব বাদে সকলেই কতকগুলি পশম কিনে ঘরে কার্পেটের কাজ কর্তে দিতে হবে।[২১]

এ প্রবন্ধেই লেখক বাবুদের আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; যেমন—ফুল বাবু, প্রগ্রেসিভ বাবু ও স্বাধীন বাবু। লেখকের ভাষায়ই আমি বাবুদের পরিচয় দিচ্ছি—"যে যত বাপের মনে দুঃখ দিতে পারিবে, সে তত প্রগ্রেসিভ বাবু হইবে। যে যত সমাজের বিপরীত কাজ করিবে সে তত সাহেব প্রিয় বাবু হইবে। যে যত মাতাপিতা, ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, প্রভৃতির প্রতি ভক্তিস্নেহ কাটাইবে তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে এবং বাবার পরিবার বাবা পুষুন, আমার পরিবার আমি পুষি এই বিলাতী পোলিটিক্যাল ইকনিমূলক লোকযাত্রা বিধানমূলক তত্ত্বের অনুগামী হইতে পারিবে, সে তত স্বাধীন বাবু, বুক ফুলাইয়া বেড়াইবে। এই সকল বাবু ইংরেজি পড়িয়া এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া স্বাধীনতানামা অমূল্য পদার্থের ঘোর ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এমন কি স্বাধীনতা না পাইলে তাহাদের অন্ন পরিপাক হওয়া, কি জীবন ধারণ করাও ভার। কিন্তু রাজকীয় স্বাধীনতা পাইবার উপায় নাই, কেননা ইংরাজের মত এদেশে পার্লামেন্ট স্থাপনের প্রস্তাব করিতে গেলেই 'কিংকং' বই আর কিছুই লাভ হইবে না। সংবাদপত্রে কিম্বা পুস্তকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন অভিপ্রায় প্রকাশের 'যো' নাই। কেননা এখনই ছোটকর্তা শ্রীঘরে পাঠাইতে পারেন। তবেই হইল উচ্চ অঙ্গের কোনো স্বাধীনতার মুহূর্ত দেখিবার কোনো প্রত্যাশা নাই, অথচ স্বাধীনতা ব্যতীতও প্রাণ হাঁপায়! এ অবস্থায় কি করেন—আর কোথায় সাধ মিটাইবেন? ঘরে বুড়ো বাপ-মা আছেন, তাহারা আপনারা না খাইয়া সকল সুখ নষ্ট করিয়াও এতকাল খাওয়াইয়া পরাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন, সকল আব্দার সহিয়াছেন, সকল সাধ পুরাইয়াছেন, এমন স্বাধীনতার সাধ পুরাইবার ভার তাঁহাদের বই আর কাহার

স্কন্ধে চাপাইতে পারেন? তাহার পর নির্দোষা সহধর্ম্মিনীদের মনে যত দুঃখ দিতে সমর্থ হয়, সে তত ফুল বাবু শিরোমণি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বাবুদের অগম্যাগমন ও অপেয় পান এই দুটিই প্রধান গুণ। অধুনা এদেশে এ শ্রেণীর বাবু যত অন্য কোন শ্রেণীর বাবু তত দেখা যায় না। এই শ্রেণীর বাবুরা একদিগে, প্রগ্রেসিভ বাবুরা একদিগে এবং স্বাধীন বাবুরা মধ্যস্থলে, এইরূপ অর্থচক্রবূহ্য সাজাইয়া সামাজিকতার সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

এ শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে বাবুদের চার ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—

১. রসিক বাবু : এ বাবুদের আর্থিক দৈন্য প্রচুর পরিমাণে—অথচ বাবুগিরির ঠাঁট রাখতেই হবে। এরা উত্তম সাজে সজ্জিত হয়ে গাঁজা ও মদের আড্ডায় এবং বাইজী ও পতিতার গানের আসরে চলে যেতো—সেখানে রসের কথা বলে অন্যান্যদের মন যুগিয়ে দু'চার পয়সা পেতো, ভোররাতে বাসায় ফিরে কোনো ভালো খাবার না পেলে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নির্মমভাবে প্রহার করতো—অথচ তারা সংসার খরচের জন্যে কোনোদিনই এই পয়সা ঘরে আনতো না। সংসার খরচের কোনো চিন্তাও করতো না—অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এ বাবুদের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতো।

২. ফেতোবাবু : এ বাবুরা বাহ্যিক আকর্ষণে সমাজের অর্থহীন ব্যক্তিকেও অপব্যয়ের মোহে আক্রান্ত করতো। ফলে প্রতারণা, শঠ ও জালিয়াতী করে অর্থ কামাই করে বাবুগিরি রক্ষায় মনোযোগী হতো। ১২৮০ সালের চৈত্র সংখ্যার "মধ্যস্থ" পত্রিকায় ফেতোবাবুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "বাইরে বাবু নাম—ঘরে বাঙ্গারাম।" অর্থাৎ বাস্তবিক ধনী নয়, অথচ ধনীর ন্যায় বাহ্যিক ভড়ং করিয়া চলিত, তাহাকে লোকে ফেতোবাবু বলিত। প্রিয়নাথ পালিতের "টাইটেল দর্পণ" প্রহসনে আছে—

মনে করি গাড়ি চড়ি বগি উল্টে পড়ে যাই।
মনত সঙ্কেট সকের বটে হাতে কিন্তু পয়সা নাই—

হরিহর নন্দীর "ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম" প্রহসনেও এ ধরনের ছড়া আছে ফেতোবাবুদের সম্বন্ধে—

জাগা নাই জমিন নাই, গল্প করে ভারী
আগে পাছে লণ্ঠন, টাকার নামে ঠন্ ঠন্
সদাই দৌড়ান গাড়ী।
কানে কলম গুঁজে ফিরে, ছিড়া কাঁথা গায়ে উড়ে
রাত্তি জ্বালায় ল্যাম্প।
ইংরেজী বকেন সদা, ডেম্ ডেম্ মা ডেম্ ডেম্—

ফেতোবাবুদের উচ্চবিলাস আর সাংসারিক অনটন যে এক উচ্চগ্রামে উঠেছিলো, এরই একটি নজীর পাই অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'কাজের খতম' প্রহসনে—

পোশাকেরই চটক বাবা! ঘরে হাঁড়ি ঠন্ ঠন্। যেমনি তুমি, তোমার সহধর্ম্মিনীও তদুপযুক্ত। গার্ডনের জন্যে আর ফাউলের জন্যে বাপান্ত না করেছে এমন দিনই নাই। ভাগ্যিস রমাকান্ত বাবুর Family Doctor হতে পেরেছিলে। তাই যা হোক করে চেয়ার বদলে কেরোসিনের বাক্সোয় বস, আর টেবিলের বদলে কলুঙ্গিতে খাচ্ছ, আর দু একটা মর্তন্মান রম্ভা বদনে দিতে পাচ্ছ।

এ প্রহসনেই গনেশের স্ত্রী রঙ্গিনী গনেশকে বলছে, 'ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারার গোসাঞি, অমন ফেতোবাবুর মুখে মারি জুতোর বাড়ি। জজেদের মেয়ের মত খেতে পরতে দিবি আর একশো টাকা করে মাসোহারা দিবি! এই লোভে জাতি খুইয়ে বে করেছিলুম।'

একেতো বাবুরা ১০ মাইনের চাকুরি করতো আর মদ ও পতিতার পেছনে ৫০ টাকা খরচ করতো। বাড়ির আসবাব, স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করে, স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবার ভয় দেখিয়ে এবং প্রতারণা করে উপরি টাকা সংগ্রহ করতো। দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের "চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনে ফেতোবাবু পরেশের স্বগোক্তিতে দুষ্কর্মের দিন শনিবারে হাতে পয়সা নাই বলে কি কাতরানিই না প্রকাশ পেয়েছে—

"আজ শনিবার প্রাণটা উড়ো উড়ো কচ্ছে, মজা-টজা কত্তে হবে। এমন মধুবারটা যে বুকের উপর দিয়ে কেটে যাবে সেটা প্রাণে সইবে না। হাতে টাকাকড়ি নেই, তা কি করবো? মাগের একখানা গয়না বেঁচতে হবে, নইলে কি এমন মজা ছেড়ে দেব? যতদিন বাঁচবো ইয়ারকি হদ্দমুদ্দ দেবো।"

বাবুদের গাঁজা ও মদের আড্ডা এবং বাইজি ও পতিতাদের আসরগুলো শনিবার ভোর হতে আরম্ভ হতো, রবিবার ভোর রাত্র পর্যন্ত ঘটা করে চলতো—সপ্তাহে এ সময়টুকু ছিলো অবাধ মাতলামীর—। চন্দ্রকান্ত শিকদার ফেতোবাবু ও বেশ্যাদের কদর্যতা নিয়ে "কি মজার শনিবার" একটা ছড়ার বই লিখেছিলেন; একটি বেশ্যার ছড়াতে আছে—

"পয়সা কড়ি সেই লাগরের
শুধুই বলে টপ্পা গা।
বোসে যদি থাকতে পারিস
ঘুম লাগে তো ঘরকে যা।"

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বুঝলে কি না" প্রহসনে ফেতোবাবু অটল সম্পর্কে কোচোয়ানের মন্তব্য—

খানে মে বড়া মকবুদ, যৈসে ওয়েলর ঘোড়া
লেকেন পয়সা দেনে মে বড়া আডিটল হোতা।

৩. হঠাৎ বাবু : হঠাৎ বাবুরা ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যহীন। জুয়া, ডাকাতি, কালোবাজারী, ফটকাবাজারী, হঠাৎ টাকা পেয়েই হঠাৎ বাবুর দল গর্জিয়ে উঠে। এ হঠাৎ বাবুদের উদ্ভব হয় বিশেষ কোনো যুদ্ধ, রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। দুর্নীতি ও অসদোপায়ে অর্থ উপার্জন করেই হঠাৎ বাবু।

বাংলাদেশে তখন নবাব সরকারের পতন ঘটেছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জেঁকে বসেছে, কলকাতা হতে চলেছে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর, ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ হচ্ছে প্রসারিত, জঙ্গলা শহরের জঙ্গল কেটে কলকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে, ষ্টিম রোলারে নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে, কারখানার চিমনীর ধোঁয়ায় কলকাতার আকাশ ছেয়ে গেছে—যন্ত্রদানবের আশীর্বাদপুষ্ট কোম্পানীর এসব কাণ্ড ঘরমুখো ও বৃত্তাবদ্ধ বাঙালি দেখছে বিস্ময়ের চোখে। কারখানার কাঁচামাল আমদানী ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানীকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীর প্রসাদে শহর কলকাতার চেহারা গেলো পাল্টে, হু-হু করে লোকের ভিড় হতে লাগলো। ইংলণ্ডে কাঁচামাল পাঠাবার কন্ট্রাকটারী, দালালি, ঠিকাদারী ও আড়তদারী করে অনেকে কাঁচা পয়সায় রাতারাতি ফুলে উঠলো। গ্রামের লোকে দলে

দলে শহরে এলো, অসহায় লোকেরা কোটিপতি বনে গেলো—। নবাবী যুগের আভিজাত্যের গর্বে গর্বিত লোকগুলো এসব কাজে এগিয়ে না আসার ফলে আর্থিক দুর্গতির কবলে পড়লো—অথচ সহায়হীন, শঠ, প্রতারক ও চালাক লোকগুলো ধনকুবের হয়ে গেলো। নতুন একটা পুঁজিপতি ও ধনতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠলো। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যহীন এ নতুন ধনকুবেরদের ছেলেরা অঢেল কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে মদ, পতিতা ও অন্যান্য মানসিক বিকৃতির পথেই টাকা ঢেলেছে। শুধু নাটক ও প্রহসন নয়, 'আলালের ঘরের দুলাল', 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস', এর মধ্যে আমরা এ বিকৃত রুচির পরিচয় খুঁজে পাব।

এ হঠাৎ বাবুর দল কিন্তু আমরা স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশেও গজিয়ে উঠতে দেখি। কালোবাজার, চোরাকারবার, সীমান্তে মাল পাচার, ব্যাঙ্কলুট, অসৎ ব্যবসা প্রভৃতির মাধ্যমে একদল সহায় সম্বলহীন প্রতারক আজ কোটি কোটি টাকার মালিক। এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যহীন অমার্জিত লোকগুলোও আবার সংস্কৃতির নামে হাস্যকর পরিস্থিরি পরিচয় দিচ্ছে।

৪. কাপ্তেন বাবু ঃ চালাকী ও কৃত্রিম প্রতাপ ও আভিজাত্য প্রকাশে এ বাবুদের জুড়িদার যেনো নবাব বা ইংরেজ সরকারও হার মানবে। 'সমাজ সংস্কার' নামক একটি গ্রন্থে শ্রী অবতার চন্দ্র লাহা কাপ্তেন বাবু সম্বন্ধে বলেন—আমি দেখিতেছি বাবু শব্দের পশ্চাতে কেবল মাত্র একটি করিয়া 'ঘোরা' জুড়িয়া দিলেও বাবুদ্বয়ের প্রকৃতিগত ভাবার্থ তত সুষ্ঠ প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং বিস্তর গভীর গবেষণায় এই স্থির করিলাম যে, ঘোর শব্দের পরেও বাবু শব্দের পূর্বে অর্থাৎ দুয়ের মধ্যস্থলে আরও একটি করিয়া বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। শব্দটি কিন্তু জাহাজী, তা কি–কি– অর্থাৎ–'বাবু–ঘোরবাবু–ঘোর কাপ্তেন বাবু।

কাপ্তেন বাবুরা ধনীর বয়ে যাওয়া আদরের দুলাল। অল্পবয়সেই তারা বাবু রোগে আক্রান্ত হয়। ধনীর দুলালদের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে দেবার জন্যে—পতিতা, বাইজী ও মদের পেছনে জলের মতো অর্থ ব্যয়ে মোসাহেব নামক একটি জীবাণু মহামারীর মতো কাজ করতো—অসৎ কাজে তারা ধনীর দুলালদের চুম্বকের মতো টেনে নিতো। সব কাপ্তেন বাবুরই একজন করে মোসাহেব থাকতো। এ সম্বন্ধে অবতার চন্দ্র লাহা তাঁর "সমাজ সংস্কার" গ্রন্থে বলেন—

"যেমন প্রফুল্ল সরোবরে পদ্ম ফুটলে ভ্রমরগুলো এসে গুন গুন করে, মধুর কলসি ভেঙ্গে গেলে মাছিগুলো এসে ভ্যান্ ভ্যান্ করে, বসন্তের উদয় হলে কুকিলগুলো এসে কুহু কুহু করে, আফিস অঞ্চলে একটি চাকরি খালি হলে চারিদিক থেকে উমেদার এসে ভেড়ে, আর গো-ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন শকুনীর টনক নড়ে, তেমনি বাজারে একটি কাপ্তেন বেরুলে মোসাহেবগুলো যেন কোথা থেকে হামড়ে এসে পড়ে—অমনি মায়ে মারা বাপে খ্যাদান হাড় হাবাতে উন পাজরে, বরা খুয়ে প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় মোসাহেব মহোদয়গণ চারিদিক থেকে এসে ধা করে বাবুকে ঘিরে বসলো,—ওহো! সে দৃশ্য কি মহা-শোচনীয়! যেন জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্তমহারথী ষড়যন্ত্র করে ব্যূহ বন্দন পূর্বক অর্জুন-নন্দন অভিমন্যুরে প্রাণ সংহারে সমুদ্যত! সে ব্যূহ ভেদ করে বালকের প্রাণ রক্ষা করে কাহার সাধ্য।"

মোসাহেবগণ বাবুর স্তব ও প্রশস্তির মাধ্যমে এটাই বলতো যে, এ বাবুর মতো এতো বড়ো বাবু আর কেহই নয়, তার মতো এতো খরচ করার মতো ক্ষমতাও অন্য কারো নেই। মোসাহেবের স্তবে বাবুর মন গলে যেতো। মোসাহেবগণ ছিলো ভয়ানক ধূর্ত-চালাক ও প্রতারক। অনেক ক্ষেত্রে বাবুর হাতে টাকা না থাকলে তারা নিজের

আংটি ও ঘড়ি বিক্রি করে বাবুকে টাকা দিতো এবং পরে বিশগুণ আদায় করতো। কাপ্তেন বাবুর সোনার বোতাম, চেইন, আংটি ও ঘড়ি অল্পদিন ব্যবহার করলেই বাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতো যে, এগুলো পুরান হয়ে গেছে সুতরাং এগুলো আর ব্যবহার করলে বাবুর সম্মান থাকে না। এগুলো বিক্রি করে সে বেশ মোটা বকসিস পেতো। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থে বলেন—ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে নিঃস্ব করিতে কিম্বা বিপদে ফেলিতে এই জানোয়ারেরাই মূল কারণ। কত কত ধনাঢ্য ব্যক্তি যে তাহারদিগের বুদ্ধিবশত মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিলেই জানিতে পারিবেন। দুগ্ধ কলা দিয়া কাল সর্প পুষিলে যেমন ফল লাভ হয়; তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও সেইরূপ জানিবে। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, এই অন্নদাস জানোয়ারে অনেকের অন্ন ধ্বংস করে শেষে অন্নদাতার এমত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে যে, তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে।

সেকালে এমন একদল ধনী লোকও ছিল যারা টাকার কুমীর বা টাকার পাহাড়। তারা অতি কৃপণ ছিল এবং ছিন্ন কাপড় পরতো, ভাল খাবার খেত না অর্থাৎ টাকা মোটেই খরচ করত না। তাদেরই ছেলেদের টাকা খরচের পথ বের করে দিত মোসাহেবেরা। কালীচরণ মিত্রের "কাপ্তেন বাবু" প্রহসন থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"ব্যাটা কত ছেলের এমনি করে সর্বনাশ করেছে। একগুণ দিয়ে চারগুণ আদায় করে।" কাপ্তেন বাবুদের যে সমস্ত মহাজন টাকা ধার দিতেন তাদের বলা হতো কাপ্তেন শিকারী। মোসাহেব সম্বন্ধে আর একটি চিত্র পাই, দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের "চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনেও—শুলিখোরের দেশ, ওখানে আর পুষ্যিপুত্র ভাল হবার যো আছে? যদি একজনের বাপ কতকগুলি বিষয় রেখে মরে যায় আর তার ছেলে যদি ছোট হয় তা হলে পাঁচ বেটা বওয়াটে বাবুয়ানা ছিলো আমাদের সমাজে অনর্থক অর্থব্যয়। কোনো সাংস্কৃতিক চিন্তা হতে নয়, আত্মঅহমিকা ও আত্মগৌরব প্রচারই একটি মোহরূপে পেয়ে বসতো রুচি বিকৃতিতে। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনে আমরা এ চিত্র দেখি—মদ্যপান, ইন্দ্রিয় যথেচ্ছাচার এবং পতিতা ও বাইজীর পেছনে প্রতিযোগিতা করে অর্থ ব্যয় করাই বাবুয়ানার অঙ্গ। এরই আর একটি চিত্র পাই লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের "মোহান্তের এই কি কাজ" প্রহসনে—

মাধব ঃ তোমার এই ২০ টাকা মাইনাতে কি করে হয়?...

কানাই ঃ আরে বোকা ছেলে! যা পাই যেখানে, তার অর্দ্ধেক আগেই হয় মায়ের হাতে, না হয় গিন্নির হাতে দি আর বাদ বাকি মামাদের দি।

মাধব ঃ মামা কারা?

ডি. সুজা ঃ সুঁড়ীরা, যারা মদ বেচে।

বাবুদের বাবুয়ানার পেছনে বেনিয়া ইংরেজের কারসাজি বাবুয়ানাকে আরো উচ্চগ্রামে তুলেছিলো। কৌশলে ইংরেজরা বাবুদের মনে দেশী জিনিসের প্রতি অরুচি আর বিলেতী জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ধরিয়ে দেয়, ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীদের হাত হতে বাজার ইংরেজের হাতে চলে যায়, দেশীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বন্ধ হয় এবং বিলেতী জিনিসে বাজার ছেয়ে যায়। দুর্গাদাস দে-র 'লাবাবু' প্রহসন তাতিনীর উক্তিতে...দেখুন, যে বাঙ্গালীরা ছেলেমেয়েদের অসুখ হলে আর খই বাতাসা খাওয়ায় না, যে বাঙ্গালীরা অফিস থেকে আসবার সময় এক পয়সার তামাক বাদে পনের আনা তিন পাইয়ের বিলাতী জিনিস কিনে আনে, যে বাঙ্গালীর মেয়েরা ফ্যান্সী পোশাকের জন্য স্বামী বেচারীকে ঋণগ্রস্ত করিতে ত্রুটি করে না, যে বাঙ্গালীরা ছেলেমেয়েকে বিলাতী দাই-এর দ্বারা লালন-পালন করায়, সেই বাঙ্গালীরা কি আবার দেশী কাপড় কিনে পরবে আশা করেন?

নব্য বাঙ্গালিরা যে বিলেতী জিনিস বিলাসের উপকরণ হিসেবে কিভাবে গ্রহণ করেছে এর একটা পরিচয় পাই অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'বোধনে বিসর্জন' প্রহসনে—"তোয়ালে এক ডজন, বর্ডারদার সিল্কের রুমাল এক ডজন, পিওর সোপ এক বাক্স, ফ্লোরিডা ওয়াটার, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, পমেটম, রোজ এ্যাটো আতর, আয়না, ব্রুস, বার্ডসাই চুরুট, হোয়াইট টুলডিজ কোম্পানী পাম্পসুজ, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি, হুইল মুগো সুতো ইত্যাদি।"

বাবুদের পোশাকের একটা বর্ণনা আমরা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশীতে পাই, নিমচাঁদের উক্তিতে—"তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ, মাতার মাঝখানে সীতে, গায় নিনূর হাপ চাপকান, গলায় বিলাতী ঢাকায় চাদর, বিদ্যাসাগর পেরে ধুতি পরা, গরমীকালে হোলমোজা পায়, তাতে আবার ফুলকাটা গারটার, জুতো জোড়াটি বোধ হয় পথে আসতে কিনেচ, ফিতের বদলে রুপোর বগলস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল, বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে দুটি আংটি।" বাবুদের বিলাস সামগ্রীর আর একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে চুনিলাল দেবের 'ফটিক চাঁদ' নামক প্রহসনে। ফটিকের দুই ছেলে গান ধরেছে—

চৌঘড়ি হাঁকিয়ে যাব সঙ্গেতে ইয়ার,
কালো পেড়ে ইউনিফরম ফেট্টা চাদর চুনটদার।
বেলদার জামা গায়ে, বলসু দিয়ে পায়
ফুল তোলা সিল্ক মোজা, সিল্কের গার্টার,
হীরে পান্নার আংটি হতে, বুকে চেনের কি বাহার।
যুঁয়ের গোড়ে গলায় দিয়ে, এসেন্স্ মাখা রুমাল নিয়ে,
ফ্রেন্সকাটে টেরী মাথায়, ঢালবো ল্যাভেণ্ডার
চলবে বুলি মজাদারী, উড়বে খালি রোজ লিকার—

শুধু বাবুয়ানা নয়, তখন বিবিয়ানারও উদ্ভব হয়েছিল। এরই একটা চিত্র পাই আমরা রামকৃষ্ণ রায়ের 'খোকাবাবু' প্রহসনে। নিম্নে বিবিয়ানার বিলাস সামগ্রীর একটা বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, দয়াল গিন্নি ঝিকে বলছে—

"যা শিগগির, পিয়ারের সাবানখানা গোলাপজলে ডুবিয়ে নিয়ে আয়। রেশমী রুমালখানা গসপেলের ফ্লোরিডা ওয়াটারে ভিজিয়ে নিয়ে আয়। ল্যাভেণ্ডারে বড় তোয়ালেখানা ডুবিয়ে আন। সিদূরে একটু বেলার আতর মিশিয়ে আন।"

ইংরেজের গড়া কলকাতা শহরে নতুনের উৎসব। আগে জমিদার ও সামন্ত প্রভুরা সভ্যতাকে গ্রামকেন্দ্রিক করে রেখেছিল আর অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাণশক্তি ছিল কুটির শিল্প। যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে কুটির শিল্প হল বিনষ্ট, সভ্যতা হল নগরকেন্দ্রিক। গ্রামের দোকানীদের মেরুদণ্ড গেল ভেঙ্গে, দেশী সামগ্রীর চেয়ে বিলেতী সামগ্রীর কদর হল বেশি। শ্যামা চরণ ঘোষালের 'বার ইয়ারী পূজা' প্রহসনে আমরা গ্রাম্য দোকানদারদের উক্তিতে পাই—"আর কারবার! সে রামও নেই, আর সে অযোধ্যাও নেই। তবে কিনা বসে না থেকে ব্যাগার খাটি, দেখ এই রামবাবু আর নবীনবাবুর বাড়ী কাপড় দিয়েই বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হতো, এখন আর তারা কেউ এখানে নেই। প্রায় সকলেই কলকাতায়, কাজে কাজেই লাভের দফা হয়ে গেছে।"

বাবায়ানা যে কুফল, সমাজকে বিশেষ বিকৃতির পথে নিয়ে যাচ্ছে—আর এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদও উঠেছে, এরই প্রমাণ পাই ১২৭৭ সালের ১০ই ফাল্গুন 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় 'অপরিমিত ব্যয়' নামক প্রবন্ধে—

চালের খড় নেই, চুলে পোমেটম, জামলার পকেটে একটি আধলা পয়সাও খুঁজলে পাওয়া যায় না, অথচ আস্তিনে রৌপ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ চারটা দু'আনি; মা ছেঁড়া কাপড় পরে ঘর গোবর দেন, নিজের বুট, পেন্টালুন, চাপকান, জোব্বা এবং টাসল দেওয়া টুপি, বাড়ীতে ভাতে ভাত, আপিসে রোজ দুই আনার কম টিফিন চলে না। অন্ন হউক না হউক, মদ খাওয়াটি চাই, এমন বাবুও অনেক দেখা যায়। তাহাদের যে কি কষ্ট তাহা তাহারই বিলক্ষণ জানেন। তাহাদের বিষয় আমরা যাহা কিছু জানি; তাহা কেবল দেখে শুনে তাহারা ভুক্তভোগী।

আয় বুঝে ব্যয় কর হবে না অভাব
আয় ছাড়া ব্যয় করা মূঢ়ের স্বভাব।

বাবুরা সেদিন যে রুচিহীনতা এবং নৈতিক চারিত্রিক কদর্যতার পরিচয় দিয়েছিল বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা রুচিবিকৃতির কাল। তাদের কাছে বহু বিবাহ এবং প্রতিযোগিতা করে বাগান বাড়ীতে অধিক সংখ্যক বাইজী, রক্ষিতা ও পতিতা রাখা ছিলো সবচেয়ে আভিজাত্যের পরিচয়। একই বাইজী, রক্ষিতা ও পতিতা নিয়ে পিতা-পুত্র, জামাই-শ্বশুরের মধ্যেও প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতার?' 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'সধবার একাদশীতেও আমরা এই বাবু বাঙালীদের কদর্যতার চিত্র পাই।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র অটলের উক্তকেই এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। অটল কাঞ্চন নামক এক বেশ্যাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। অটলের শ্বশুর গোকুলচন্দ্র অটলকে বলছে, "সে বেশ্যাটিকে তোমার ত্যাগ করতে হবে।"

অটল ঃ আহা! কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ শীতল হয়ে গেল, কাল আমি দশ হাজার টাকা ভেঙ্গে তার গহনা কিনে দিলেম, ঘর সাজায়ে দিলেম, আজ আমি ছেড়ে দিই আর উনি গিয়ে ভরতি হন।

সুরাপান, বাইজী, রক্ষিতা ও পতিতা রাখাই ছিল সবচেয়ে আভিজাত্যের পরিচয়, এ সবের পেছনে যে যত বেশি ব্যয় করতো সমাজে সে বেশি প্রশংসা পেত আর গৌরবশীর্ষেরও আসনে অধিষ্ঠিত হত। বাগান বাড়িতে পতিতা ও রক্ষিতা না রাখাই ছিল লজ্জা ও নীচতার পরিচয়। 'সধবার একাদশী' থেকে আর একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। পতিতা কাঞ্চন অটলের অলক্ষ্যে নকুলের বাগানে গিয়েছিলো—ইহাতে অটলের মান-সম্মানে আঘাত লাগে। তার উক্তি, "তুমি কেন নকুলের বাগানে গেলে তা বলো, আমি তোমার সম্মুখে গুলি খেয়ে মরবো।" কাঞ্চন বলছে, "ইহাতে কি হয়, তোমার লোক নকুলের বাগানে যাবে আর নকুলের বাগানের লোক তোমার বাগানে আসবে।" সাথে সাথেই অটলের উক্তি ঃ "তার সাত পুরুষ কখনো মেয়ে মানুষ রেখেছে? শালা এত বড় মানুষ, তবু একটা মেয়ে মানুষ রাখতে পারে না, গান শুনবার নাম করে আমার জানিকে (কাঞ্চন) বাগানে নিয়ে যায়। আমি তাকেও কিছু বলব না তোমাকেও কিছু বলব না, মাথা কুটে মরবো।"

কাঞ্চন ঃ আমি ত তোমার মাগ নই যে বাগানে গেইচি বলে মাথা হেট হবে।

অটল ঃ ঘরের মাগ বেরিয়ে গেলে আমার মাথা হেট হয় না, তুমি আমায় ফাঁকি দিলে কেন?

সমাজে মানস-রুচির এ বিকৃতির ফলে প্রকাশ্যে পতিতালয়ে যাওয়া, বাড়িতে পতিতা এনে আমোদ করা মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। বিবাহের পর স্বামীর সাথে স্ত্রীর

কোন সম্বন্ধই থাকত না, স্বামী থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে বিধবার মত জীবনযাপন করতে হত। 'সধবার একাদশী' থেকে আর একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, অটলের স্ত্রী কুমু ননদী সৌদামিনীকে বলছে—

কুমু ঃ এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল। আমি ভাই আর সইতে পারিনে, আমি গলায় দরি দে মরবো।

সৌদামিনী ঃ আস্তে বলিস, মা শুনলে রাগ করবেন।

কুমু ঃ করুন গে, সাধে বলি! মনের দুঃখে বলি, দেখ দেখ ভাই, রক্ত মাংসের শরীর তো বটে! ঠাকুর জামাই এক শনিবার না এলে তোমার মনটি কেমন হয়? চোখ যে ছল ছল কত্তে থাকে।

ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কুরূপা পতিতার প্রতি আসক্তির পরিচয় মিলে নিম্নের উক্তিগুলোতে—

সৌদামিনী ঃ দাদার ভাই কেমন পিরবিত্তি, তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্ত মাগ রেখে সেই সুঁটকো মাগীকে নিয়ে থাকে—দেখছিস তার হাত-পাগুলো যেন বাকারী।

কাঞ্চনকে নিয়ে অটলের বাসার আর একটি দৃশ্য—

সৌদামিনী ঃ দাদা মদ খেয়ে কাঞ্চনের গলা ধরে বারাণ্ডায় নাচতে লাগলেন, পাড়ার সবলোক জড়ো হলো, ও বাড়ির বড় কাকা এসে দাদাকে বকতে লাগলেন, আর কাঞ্চনকে গালাগালি দিলেন। সে বেটি 'কসবি'।

বড় কাকাকে মানবে কেন, সেও ফিরিয়ে গাল দিল, বড় কাকা রাগ করে বেটিকে বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। বেটি দাদাকে কত গাল দিয়ে গেল, আর বলে গেল, তোর বাপ যদি আমায় আসতে বলে তবেই তোর সঙ্গে দেখা, তা' নইলে এই পর্যন্ত।

বড় কাকা বেরিয়ে গেলে দাদা একটা বন্দুক বের করে বলেন, "এখনি গুলি খেয়ে মরবো।"

মা দাদাকে বলেন, "এমন পরীর মতন বউ ঘরে আর... ।"

দাদা বলেন, "আমার কাঞ্চনকে এনে দাও, নইলে গুলি খেয়ে মরবো, গঙ্গায় ডুবে মরবো ... ।"

বাবা বলেন, "এমন সোনার সীতে ঘরে আছে...

দাদা বলেন, "সীতে নিয়ে তুমি থাক, আমি কাঞ্চনকে না পেলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।"

মা কাঞ্চনের হাত দুটি ধরে বলেন, "মা তোমার হাতে ছেলে সুঁপে দিলেম—যেন আমি গোপাল হারা হইনে।"২২

গাঁজা ও মদ না খাওয়া ছিলো অসভ্যতার পরিচয়; এখানে দুটো উদহারণ দিচ্ছি—

"কলিকাতায় যেখানেই যাওয়া যায়, সেইখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধা, সকলেই মদ পাইলে অন্ন ত্যাগ করে। কথিত আছে কোন ভদ্রলোক এক গ্রামে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেখানে দেখিলেন, প্রায় সকল লোকই অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গ্রামে কতলোক গাঁজা খায়? গাজাখোরের একজন উত্তর করিলেন, "আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি। গ্রামে শালিগ্রাম ঠাকুর ও আমাদের টেপী পীসি যাহার বয়স ৯৯ বৎসর তারাই খারিজ আছেন। কলিকাতা এখন তদ্রূপ।"

(প্যারীচাঁদ—মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়)

মদ না খাওয়া যে 'হাবা বাঙ্গাল'—এর পরিচয় দেয়া এবং নীচস্তরে থাকা তা কলকাতার বাবুদের কবলে আক্রান্ত বিক্রমপুরের রাম মানিক্যের উক্তিতেই সুষ্ঠু ধরা পড়ে—

"পুঙ্গির ভাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কইয়া মস্তক গরাইয়া দিচে—বাঙ্গাল কউস ক্যান, এত অকাদ্য কাইচি, তবু কুলকাত্তার মত হবার পারচি না? কুলকাত্তার মত না করচি কি? মাগী বাড়ী গেচি, মাগুরি চিকুন ধুতি পইরাচি, গোরার বাড়ীর বিস্কিট বক্ষোন করচি, বাণ্ডিল খাইচি, এতো কইরাও কুলকাত্তার মত হবার পারলাম না, তবে এ পাপ দেখতে আর কাজ কি? আমি জাল ঝাঁপ দেই, আমারে হাঙ্গরে, কুম্ভীরে বক্ষোন করুক।"

(সধবার একাদশী)

বাবু বাঙালির আরো নিখুঁত চিত্র আমরা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয় ও দূতি বিলাসে। সেদিনকার সমাজের ক্লেদ ক্লিন্নতার চিত্র তিনি আকাড়া বাস্তবতার আকারে তুলে ধরেছেন।

বিদেশীর প্রশ্ন ঃ

মহাশয় আমি শুনিয়াছি যে, অনেক ভাগ্যবান লোকের নিকট কতকগুলিন লোক নিয়মত যাতায়াত করে প্রতিদিন প্রাতঃকালে যায় বেলা দশ এগার ঘণ্টা বসিয়া থাকে এবং বৈকালে যায় রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তথায় কালযাপন করে আর ইহাদিগের কেবল এই কর্ম যে অনবরত বাবুর হাই উঠিয়ে তুড়ি দেয় এবং আজ্ঞা যে আজ্ঞা মহাশয় ২ করে, ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ সকল লোক কোন কর্মে পারগ কিনা, আর কোন শাস্ত্রে কিছু দৃষ্টি আছে কিনা; আর ইহারা যে যেখানে গিয়া থাকে সে নিয়ত তাহারি নিকট গমনাগমন করে, একি সর্বত্রই যায় এই তাহাদিগের কর্ম, আমি এই সকল ব্যক্তির বিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত অন্তঃকরণে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।

লুচ্চ বৃত্তান্তে লুচ্চ চরিত্র সম্বন্ধে বলা হয়—

লোকে যারে বলে লুচ্চ সে কেবল জানিয়া তুচ্ছ
লুচ্চ বিনে মজা জানে নাই।
মারে মণ্ডা আদা হেনা সদা থাকে বাবুয়ানা
সোনা দানা তুচ্ছ তার ঠাই।

'কুসুম খণ্ডে' বাবুর লক্ষণ আরো স্পষ্ট—

ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন। কলিপা সঙ্গে কখন বাগানে কখন নিজ ভবনে নানা জাতি প্রমোদেনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়নপূর্বক আপন মন খুসি করিতেছেন। খুসির তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনে অক্ষম হইলেন, এক দিবসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি। কলিপা কহিলেন কল্য বাগানে সকল রকম মজা দেখাইব, কিন্তু পাঁচশত টাকা অদ্য ব্যয় করিতে হইবে। বাবু কহিলেন, খলিফা অদ্য আমার হস্তে একটি টাকাও নাই; সম্প্রতি টাকার কি হইবেক। খলিফা বলিলেন, বাবুজী আমি তোমার নিকটে যত দিবস থাকিব তত দিবস টাকা নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না, কেবল তুমি আপন নাম সহি করিয়া দিবা। বাবু আহলাদসাগরে মগ্ন হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, আর কহিলেন শীঘ্র টাকার সুযোগ অর্থাৎ ফিরিক করহ।

'ফলখণ্ডে' বাবুর ভয়াবহ শেষ পরিণতি দেখানো হয়েছে—

প্রথমে একফল এক মহাজন টাকার নিমিত্ত লোক পাঠাইলেক, বাবু কহিলেন লোট বদল করিয়া দিব। লোট বারম্বার ফেরাফেরি হইয়াছে অনেক টাকা পাওনা হইল, তাহারা সে কথা শুনিয়া ওয়ারিন করিলেক। খলিপা কহিলেন, একি হয়, পেয়াদা লইয়া যায়, তিনি কহেন চিন্তা কি, যাওনা কেন। তাহারা বাবুকে জেহেলখানায় লইয়া গমন করিল মোসাহেব লোক কে কোথায় পালাইল—সুর বাবু বাটি প্রস্থান করিলেন পরে সন্ধ্যাকালে একজন লোক আসিয়া বাবুর পিতা কর্ত্তামহাশয়কে সংবাদ করিলেক মহাশয় আপনার পুত্র বাবু জেহেলে কয়েদ হইয়াছেন সেস্থানে নিরাসন বসিয়াছেন অতএব বিছানা ও বালিশ পাঠাইলে ভাল হয়। কর্ত্তা ঐলোকের প্রমুখাৎ তাবদ্বিষয় অবগত হইলেন, পরে বাবুর সতী সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কিরূপ মনে মনে খেদ করিতেছেন তাহা শ্রবণ করেন। এবার বাবুর সতীর বিলাপ—

আমার সমান নারী ত্রিজগতে নাহি হেরি
আমি নারী অতি অভাগিনী।
ধনেমানে কুলে শীলে বর দেখি বিয়া দিলে
সমাদরে জনক জননী—
বিবাহের পর আসি শ্বশুর ঘরেতে বসি
দিবানিশি থাকি একাকিনী।
নবীন যৌবন ভরে চিরকাল কামজ্বরে
পুড়ে মরি দিবস রজনী—

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'নরবাবু বিলাসের' তিন বছর আগে 'সমাচার দর্পণে' 'বাবুর উপাখ্যান', 'সৌখিন বাবু', 'বৃদ্ধের বিবাহ', 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত', 'বৈষ্ণব' ও বৈদ্য' সংবাদ নামে ব্যঙ্গ রসাত্মক বেনামী সমাজচিত্র প্রকাশিত হয়। আলালের ঐতিহ্য যেমন নববাবু বিলাস, তেমনি নববাবু বিলাসের ঐতিহ্যের এ রচনাগুলো এবং এ রচনাগুলো ভবানীচরণেরই রচনা। ছদ্মনামে লেখা ভবানীচরণের একটা বাতিকও ছিলো এবং এসব চিত্র স্বনামে তুলে ধরা সেদিন ভয়ও ছিল, কাজেই নববাবুর বিলাসও তিনি ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে লিখেছিলেন। সেদিন ভবানীবাবু ছাড়া অন্য কোন লেখকের হাতে এসব চিত্র এতো আকর্ষণীয় ও রসগ্রাহী হয় নি। 'বাবু উপাখ্যান' হতে একটু উদ্ধৃতি দিলেই ননবাবু বিলাসের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাব—

: তিলকচন্দ্র ক্রোড়ে ব্যতীত মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন না, মহা আদর্ষে মত কত লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুত্রের শরীরে যত ধরে তত অলঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন, দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে, স্বর্ণে ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। এভাবে তিলকচন্দ্র দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। সকলকে কটুবাক্য বলেন, মারধর করেন, সর্বদা মিথ্যা কথা বরেন। লেখাপড়া করাইলেন না, কারণ দেওয়ানজী বলেন, আমার এত ঐশ্বর্য, রাখিয়া খাইতে পারিলে খাইবে, না রাখিতে পারিলে আমি আর কি করিব। বাবু ঘুড়ি, বুলবুলি খেলাতে মত্ত থাকেন, ইয়ার বন্ধু জুটাইয়া আমোদ প্রমোদ করেন।'

বাবার মৃত্যুর পর তিলকচন্দ্রের কণ্ঠ হইতে ঝুম ঝুম করে স্বর্ণের ইষ্টক পড়া আরম্ভ হলো। ইতিমধ্যে মোসাহেবের দল তাকে নিঙড়িয়ে শেষ করেছে। তাই 'কিছুকাল পরে বাবু মনে ভাবিলেন যে, আমার পিতা চাকুরী করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য অতএব আমার চাকুরী কর্তব্য চাকরি না করিলে মানেও না দশজন প্রতিপালনও হয় না।'

এরপর বাবু দেশীয় প্রথায় জীবনধারণ করে বুঝলেন যে, এভাবে সাহেবদের কাছে কোনো কাজ পাওয়া যাবে না। এবার তিনি সাহেবীপনা আরম্ভ করলেন। 'সাহেবদের মতো বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান আর একদিন বাবুকে ছায়ের গাদায় ফেলে দেন-চোখে, মুখে সারা গায়ে ছায়ে আচ্ছাদিত হয়ে বাবু ভূত সাজিলেন।' সাহেবদের মতো উচ্চারণে কথা বলতে গিয়ে বাবু হাস্যাস্পদ হন। সাহেবরা রাগ করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘুসি মারেন-বাবুও ঝি নগরাসীর উত্তর :

আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে অনেকের নিকটে লোক নিয়ত যাতায়াত করে বটে, যে সকল লোক গমনাগমন করে তাহার মধ্যে অনেক প্রকার লোক আছে কেহ ২ বাঙালা পারসি ইংরেজী শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন হইয়া ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে তাহার গুরু পুরোহিত করতে অতি নিপুণ কন্যাভগিনীর বিবাহের ভারাক্রান্ত হইয়া তদুদ্ধার উপলক্ষে যাতায়াত করিতেছে, কেহ বাবুর সহিত আলাপ কৌশল করিবার নিমিত্ত নিয়ত যাইতেছে। মনোনীত কথা কহিতে ও কর্ম্ম করিতে তাহারা বিলক্ষণ পারগ, তাহাদিগের সঙ্গে লইয়া বাবু স্থান বিশেষ গমন করেন, লোকে তাহারদিগের কহে ইহারা অমুক বাবুর মোসাহেব ইহাতে তাহারা মহা আনন্দিত থাকে এবং তাহার মধ্যে দুই চারি পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন তাহারা কখন শাস্ত্র বিচার করেন, কখন শাস্ত্রের তাৎপর্যও শুনেন, ইহাতে বোধ হয় যে, তাহারাও উপাসনায় পারদর্শী হইবেন, কোনো ২ ব্যক্তির গান বাদ্যাদির শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, বাবুর যখন তদ্বিষয়ে বাঞ্ছা হয়, তখন তাহারা তদ্দারা তাহাকে আমোদিত করেন কতকগুলিন লোক আছে, তাহারা মিথ্যা গল্প করিতে ও লোকের কুৎসা প্রকাশ করিতে বিলক্ষণ নিপুণ, তাহারা সময়ানুসারে বক্তৃতা করে আর এ সকল লোক একজনার নিকট নিয়ত যাতায়াত করে এমন নহে পাত্র বিশেষে অনেকের নিকটে যায়, এক্ষণে আপনকার ব্যাকুল চিত্তকে সুস্থ করিয়া আমাকে অনুকূল হও।

এ বর্ণনায় পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে যাবার এবং নতুন সমাজ, অর্থনীতি ও শ্রেণীবিন্যাস গড়ে উঠার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এবং নতুন জীবনদর্শনের আভাসও সুস্পষ্ট। নতুন পুরাতনের এ দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে এবং এরই প্রথম সুনিপুণ বিশ্লেষণ পাই আমরা ভবানীচরণে। অর্থনীতি ও উপার্জনের ভিত্তিতে যে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজ চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে—সমাজের এ ভাঙাগড়া সমাজদ্রষ্টা ভবানীচরণের চক্ষুকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ বা কৌলিন্য নয়—অর্থনীতির উপরই যে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠা এও ভবানীবাবু তুলে ধরেছেন। সমাজ জীবনের এই স্বরূপ উপলব্ধির মধ্যেই যে উপন্যাসের জীবন নিহিত ছিল তাকে অঙ্কুরোদগম করানোর দায়িত্ব ভবানীবাবু যথাযথভাবে পালন করেচেন এ ভুলে গেলে চলবে না।

'কলিকাতা কমলালয়ের' সার্থক উত্তরণ 'নববাবু বিলাস'। এ নববাবুরাই পরবর্তীকালে এক একটি সার্থক চরিত্র হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। ভবানীচরণ প্রমথনাথ ছদ্মনামে এ গ্রন্থ রচনা করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর চল্লিশ বছর পূর্বে এ গ্রন্থ লেখা। রচনা সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার বলেন—

তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত: তদ্দারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীন্তন অনেকে তদৃষ্টে কুকার্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন।

এ গ্রন্থেই বাংলা সামাজিক উপন্যাসের মহানায়কেরা উঁকি দিয়ে উঠেছিল এ তৎকালীন সমাজের বিকৃত মানসরুচির জীবন্ত পরিচয়ও এতে আমরা পাই। 'সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে এ সম্বন্ধে বলা হয়—

শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

এক্ষণে নতুন বাবুরদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রামবাসীর কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী প্রতি পত্নীর কুক্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু 'নববাবু বিলাস' ও 'কলিকাতা কমলালয়' এবং 'দূতী বিলাস' গ্রন্থ অপূর্ব উপদেশে উক্ত দোযোদ্ধার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন। ৫ই ভাদ্র, ১২৩৮ সাল।

'নববাবু বিলাস'-এ ভবানীবাবু তৎকালীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যহীন ভুইফোড় কাঁচা পয়সাওয়ালাদের ছেলেদের মানসরুচির বিকৃতির চিত্র ধরেছেন। ইহা সেদিনকার সমাজ চিত্রের এক বাস্তব দর্পণও বটে। বাবু চরিত্রের বর্ণনায়—

বাবু সকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম উত্তম গ্রন্থ অর্থাৎ পারসী, আরবী, ইংরাজী কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারীর মধ্যে সুন্দর শ্রেণীপূর্বক এমন সাজাইয়া রাখেন যে দোকান্দারের বাপেও এমন সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না—আর তাহাতে এমন যত্ন করেন একশত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারে না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে—অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাক।

'নববাবু বিলাস' মোট চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম 'অঙ্কুর খণ্ডে' বাবুদের শিক্ষার বর্ণনা। বাবুদের বিদ্যা, বিদ্যার বিচার ও স্কুল মাস্টারের কাহিনী—এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—কোন হিন্দুস্থানী বেশ্যা কিম্বা বাঙ্গালি বেশ্যা অথবা মেথরানী গর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠ কারণ নিযুক্ত করিলেন। সাহেবের মেজের সজ্জা এবং খানা ও টিফিন খাওয়াদাওয়া দেখিয়া, বাবুদিগের প্রায় তদনুরূপ ব্যবহার হইল আর সাহেবের সহিত সর্বদা কথোপকথন দ্বারা খাড়ামী, রাসকেল, বেরিগুড, বহুট, ছোট, নানসেন্স, গোটে হেল, এইরূপ কতকগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং দুই একখান ইংরাজী চিঠি পাঠ করিতে পারেন এবং ইংরেজী ভাষাতে কোন লোক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সাহেবের মত শুদ্ধ উচ্চারণপূর্বক উত্তর করেন।

চাকরদের উপর তাই করেন। সাহেবদের অনুকরণে উচ্চারণ করতে গিয়ে দাতারাম ঘোষকে ডাটারাম গাস বলেন।

'নববিবি বিলাস' ভবানীচরণের ভোলানাথ ছদ্মনামে রচনা। এর লেখক যে ভবানীচরণ তা গ্রন্থের ভূমিকা হতেই বুঝা যায়—

'নববাবু বিলাসে' নববাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফলখণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবিরূপ প্রধানমূলের অঙ্কুরাবধি শেষফল সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই, এ নিমিত্ত তৎপ্রকাশে প্রয়াস পূর্বক 'নববিবি বিলাস' নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম'।

বাবুদের মত নববিবিদের পরিণামও যে কত ভয়ঙ্কর এ চিত্র তুলে ধরাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর বর্ণনায়—

'বেশ্যাসক্ত এক ব্যক্তির অবহেলিত যুবতী পত্নীকে এক নাপিতানি গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া নিজের গৃহে লুকাইয়া রাখিল এবং তাহাকে পাপ ব্যবসায় লিপ্ত করিয়া অর্থোপার্জন করিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া পুলিশ তাহাদের দু'জনকেই গ্রেপ্তার করিল, নাপিতানির জেল হইল, যুবতী কুলস্ত্রী পতিতালয়ে নাম লেখাইয়া নববিবি বলিয়া পরিচয় লাভ করিল, তারপর পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল। নববিবি গীতবাদ্য ও নৃত্য শিক্ষা লাভ করিল। এক প্রাচীন বেশ্যাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহার শিক্ষা তত্ত্বাবধানেই সে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল।'

প্রাচীনা বেশ্যা তাহাকে শিক্ষা দিয়া সকল বিষয়ে দক্ষ করিয়া তুলিল। কিছুকাল তাহার অধীনে থাকিয়া ব্যবসা করিবার পর একদিন নববিবি সেই প্রাচীন বেশ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ডাকওয়ালার সঙ্গে পলাইয়া গেল। নিজের অর্থ ব্যয় এবং অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ডাকওয়ালার সঙ্গে কিছুকাল কাটাইল, তারপর যখন সকল অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন একদিন ডাকওয়ালা তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। তাহার রূপ যৌবন তখন অস্তমিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যবসায় আর চলে না, অতঃপর নববিবি দাসীবৃত্তি আরম্ভ করিল কিন্তু দাসীবৃত্তি করিবারও শক্তি নাই; অবশেষে কুট্টিনী বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতেও একবার পুলিশের হাতে পড়িতে পড়িতে কোন মতে বাঁচিয়া গিয়া সে বৃত্তি পরিত্যাগ করিল; তখন ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করিল। উপসংহারে 'নববিবি' এই বলিয়া বিলাপ করিতেছিল—

আমার দুঃখের কথা করি নিবেদন।
শুনিয়া সতর্ক হও কুলনারীগণ।

সমাজের এই রুচি বিকৃতির আর একটি চিত্র পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনায়—

একরাত্রিতে রাজ বাটিতে এক অপূর্ব্ব রূপসী ও অসাধারণ সুকণ্ঠা তয়কাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কে প্রস্তাব করিলেন যে, এই রমণী সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে। তখন সুরাপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল ছিল; সুতরাং এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। ঐ সুন্দরী যখন পেশোয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালপেড়ে সূক্ষ্মাধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী অবতীর্ণ হইলেন দর্শকবৃন্দ ঢুলু ঢুলু নয়নে এইরূপ দৃষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ যুগ আপন আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তাহারা এ সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাহার পদ শেষে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন।২৩ বাবু বাঙালীদের পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর বিলাসী লোকের পরিচয় পাওয়া যায় এরা 'বড় মানুষ' নামে পরিচিত ছিল। এই বড় মানুষদের একটা পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় বড় মানুষের রোজনামচায়।

গত বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে বেলা ৯ ঘন্টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ১০ ঘন্টার সময়ে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চা-পান করিলাম, পরে দুই চারিজন বন্ধু আসিলেন তাঁহারদিগের সহিত দুটো খোসগল্প করিয়া স্নান করিলাম, স্নান করিয়া আর কর্ম কি, বেলা যখন ১১টা তখন ভোজন করা গেল, ভোজনান্তে যেমন অভ্যাস আছে, কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রাগত হইলাম, এবং বেলা যখন দুই প্রহর চারি ঘণ্টা তখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক দশজন বন্ধুর সমিত তাস খেলা এবং অন্য অন্য প্রকার আমোদ করা গেল, তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল, পরন্তু সন্ধ্যার পর রাত্রি দশ ঘণ্টাবধি গান বাদ্য করিয়া আহারান্তে স্থানান্তরে গমন করিলাম।

শুক্রবার—৭ ঘণ্টার সময় বাটী আসিয়া একবার নিদ্রা গেলাম, ১০টার সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে দিন আর চা পান করিতে ইচ্ছা হইল না, স্নানভোজন করিতে দুই প্রহর অতীত হইল, পরে নিদ্রা গিয়া বেলা যখন ৩টা তখন একবার নীলাম দেখিতে গমন করিলাম, আমার চেরেটের জন্য একটি ঘুড়ি ক্রয় করিতে মানস ছিল, কিন্তু মনোমত প্রাপ্ত হইলাম না, সুতরাং নীলাম পরিত্যাগপূর্বক একবার সুপ্রীম কোর্ট এবং কার ঠাকুরের হৌস দেখিয়া বাটী আসিলাম, বস্ত্র ত্যাগ করিয়া জল পান করিলে আমি, হরিবাবু এবং শ্যামবাবু একত্র হইয়া বাগানে গমন করিলাম, সেদিন আর বাটী আসা হইল না, রাত্রি ১০টার সময়ে বাগান হইতে অমনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম।

শনিবার—শুক্রবার কোনো বিষয় উপলক্ষে অধিক রাত্রি জাগরণ প্রযুক্ত স্থানান্তরে অধিক বেলা অবধি নিদ্রা যাইতেছিলাম, পরে দুইজন বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বেলা ১০টার সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, তাহারদিগের সহিত অনেক পরিহাস ও কথোপকথনপূর্বক স্থির হইল যে খড়দহে রাসযাত্রা দেখিতে যাইব, অনন্তর বাটী আসিয়া স্নান ভোজনান্তে খড়দহে যাত্রা করিলাম, দুইজন...লোকও সঙ্গে ছিল, তাহাতে যেরূপ আমোদ হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

রবিবার—অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময়ে বাটী আসিয়াছি, আবার—বাবুর বাগানে নিমন্ত্রণ আছে, বৈকালে যাইব, সেখানেও অদ্য রাত্রিতে অত্যন্ত আমোদ হইবে।

বড়মানুষ[২৪]
কলিকাতা
৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার।

পত্রটির শেষে বিদ্যাদর্শন পত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য ছিল—

'বড়মানুষ মহাশয় যে সুখের পত্র লিখিয়াছেন, সকলেই তাহা পাঠ করিয়া অনেক আমোদ করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার প্রতি এই মাত্র উক্তি করি যে, তিনি যদি তাঁহার সমুদয় জীবনের এইরূপ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, তবে জনসমাজে কি প্রকার পরিহাসের পাত্র হইবেন, তাহা বিবেচনা করুন।২৫

বারোয়ারী উৎসব তখন খুব আড়ম্বরে হত। ধনীরাই এ বারোয়ারী উৎসবের আয়োজক ছিল। কিন্তু বারোয়ারী উৎসবে যে অশালীন ও রুচি বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যেত এরই চিত্র তুলে ধরেছে সেদিনকার 'সম্বাদ ভস্কার' পত্রিকা। ঐ পত্রিকা থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি—

বারোওয়ারির উৎপত্তি কি পল্লীগ্রামে কি কলিকাতা সকল স্থানেই সমান, কলিকাতার মধ্যেও অকর্ম্মণ্য জঘন্য লোকেরা বারোএয়ারি ছলে পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর অত্যাচার করে, পাড়ার মধ্যে দশ বিশ জন একত্র হইয়া চাঁদা ফাঁদিলে সকলকেই সে ফাঁদে পড়িতে হয়, বিশেষতঃ গরীব লোকেরা তাহার মধ্যে না গেলে পল্লীতে, বসতি করিতে পারে না। পশুজ্ঞান পাণ্ডারা নানা প্রকারে তাহাদিগের উপর অন্যায় করে, দিন পরিশ্রমি দীন লোকেরদের এই বিশেষ ভয় পাণ্ডাদলের ক্রোধ হইলে স্ত্রীলোকদিগের মানের উপর কলঙ্ক হইবে, অতএব আপনারা দুঃখ পাইয়াও গরীবেরা বারোএয়ারির চাঁদা

অগ্রে দেয়, ইহাতে কলিকাতার প্রায় প্রতি পল্লীর দরিদ্র লোকেরদের অতিশয় দুঃখ হইয়াছে, বারোএয়ারি পাণ্ডারা এইরূপে সকলের মাথায় হাত বুলায়, কিন্তু তাহারদিগের কর্ম এই যে দেবদেবীর এক এক প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া তদুপলক্ষে বোতলের ঘাড় ভাঙ্গে, আর কবির আসরে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে... ।[২৬]

সমাজের বড়লোকেরা যে কি কদর্য বিলাসিতা ও রুচি বিকৃতিতে নিমজ্জিত ছিল এরই আর একটি চিত্র তুলে ধরেছে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকাই—

...সম্পাদক মহাশয়, লজ্জার কথা কি কহিব গত শনিবার প্রাতে আমি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম মাহেশ হইতে এক বজরা আসিতেছে, ঐ বজরাতে খেমটা নাচ হইতেছিল, তাহাতে আরোহি বাবুরা নর্ত্তকীদিগের নিতম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এমত নৃত্য করিলেন তাদৃশ নৃত্য ভদ্র সন্তানেরা করিতে পারে না...শুক্রবার শেষ রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, এই জন্য স্ত্রীলোকেরা অতি প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, বাবুরা ঐ কুলবালাগণকে তাহা দেখাইয়া ত্রিকুল পবিত্র করিলেন... ।[২৭]

খেমটা নাচ হতো তখন খুবই হাঁক-ডাক করে! খেমটা নাচে প্রকাশ পেতো আদি রুচি বিকৃতি ও অশালীনতা। এই খেমটা নাচের একটি চিত্র তুলে ধরেছে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা।

এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্মসূচক আমোদেই অজস্র লিপ্ত থাকে।...বিশেষতঃ বালকেরা যখন শাসনকর্ত্তা পিতা-ভ্রাত প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্ম পঙ্কে পতিত হইতে দেখে তখন আপনারা তৎপথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা করিবে? ইহা কি শত স্থানে প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে পিতার রক্ষিতাগণিকার গৃহে অতি বালক পুত্রাদি সম্বন্ধে গমনাগমন করিতেছে? তথায় তাহারা পরিপাটীরূপে লম্পট ব্যবহার শিক্ষা করিয়া বয়স্ক হইলে কন্টকস্বরূপ যে তাহাদিগের পরিবারের পীড়াদায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি?

অধুনা লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে। পল্লীগ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন যুবারা অনেকে বিষয় কার্য্যের জন্য কলিকাতায় আগমনপূর্বক অনেক কৌশলে কোন এক স্ববয়স্ক ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাদিগের ভাগ্যবশত যদি সেই বাবু কুচরিত্র এবং লম্পট হয়েন, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য্য একেবারে তাহাদিগের নষ্ট হয়। তাহারা সেই বাবুর তুষ্টির জন্য তাঁহার প্রিয় কুকর্ম সকলের উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উদ্যোগি এবং নিপুণ হয়, এবং সে সকল ঘৃণিত ও গর্হিত আমোদের আস্বাদন পূর্বে অজ্ঞাত ছিল, তাহাতেও ঐ বাবুর নিকটে সুন্দর রূপে শিক্ষিত হয়।[২৮]

(সংকলিত) –সফিউদ্দিন আহমদ

[এসব ছিল তৎকালীন বাঙ্গালী ভাষা সমাজের মন-মানসিকতার বৈশিষ্ট্য। যদিও প্রায় দু'শ বছর অতীত হতে চললে তবুও এরই ধারাবাহিকতা এখনো সমাজে ফিতাক্রিমির মত জড়িয়ে রয়েছে। এ বিধ্বংসী মন-মানসিকতার প্রভাব বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যেই আমাদের এ প্রচেষ্টা। সুষ্ঠু সমাজ নির্মানের লক্ষ্যে আগামী দিনের গবেষকরা এ থেকে প্রচুর উপাদান পাবেন বলে আশা করা যায়।]

–সম্পাদনা পরিষদ

তথ্য নির্দেশনা

'উনিশ শতকের রেনেসাঁ' কথাটি একটি বিতর্কিত বিষয়। অনেকেই একে রেনেসাঁ বলেছেন আবার অনেকেই একে রেনেঁসা বলতে নারাজ, এমন কি তাঁরা এর বিরূপ সমালোচনাও করেছেন। যাঁরা রেনেসাঁ বলতে নারাজ তাঁদের মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে।

রেনেসাঁর পক্ষে যাঁরা, তাঁরা "ভারতের রেনেসাঁ" "বঙ্গীয় রেনেসাঁ" ও আরো অনেক কথা বলেছেন। সুশোভন সরকারের বইয়ের নাম "বেঙ্গল রেনেসাঁস অ্যাণ্ড আদার এসেজ'।

অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বিরোধীদের রীতিমত সমালোচনা করে একে উনিশ শতকের রেনেসাঁ বলেছেন।

১. ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশত বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিল্প বিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল। (শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃষ্ঠা-৯।)
২. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃষ্ঠা-৪২।
৩. নিকি নামক এক বাইজী সে সময় সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কোলকাতার এক ধনী ব্যক্তি এ নিকিকে মাসিক এক হাজার টাকা মাসহারায় রক্ষিতা হিসেবে রেখে সমাজে পদস্থ ব্যক্তির সম্মান অর্জন করেছিল। রামমোহন দ্বারকানাথ তারই নৃত্য-গীত উপভোগে আনন্দ পেতেন। রামমোহন রায়ের বাড়িতে এ নিকি বাইজী বহুবার নৃত্যগীত পরিবেশন করেছে। সমাচার দর্পণ, ১৭ই অক্টোবর, ১৮১৯।
৪. শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ রামতনু লাহিড়ী ও বঙ্গ সমাজ, পৃষ্ঠা-৫৬
৫. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৭
৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পৃষ্ঠা-৬
৭. বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সামজচিত্র, পৃষ্ঠা-২০৭
৮. ঐ পৃষ্ঠা-২০১
৯. বিদ্যাসাগর রচনাবলী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪০
১০. ঐ পৃষ্ঠা-২৪৫
১১. ঐ পৃষ্ঠা-২৫১
১২. ঐ পৃষ্ঠা-২৬০
১৩. ঐ পৃষ্ঠা-২৬৭
১৪. ঐ পৃষ্ঠা-২৭০
১৫. বিনয় ঘোস, সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজ চিত্র, পৃষ্ঠা-১৩২
১৬. ঐ পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৬
১৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৪
১৮. শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃষ্ঠা-৪৩
১৯. বান্ধব, আশ্বিন-কার্তিক, ১২৮১
২০. মধ্যস্থ, চৈত্র সংখ্যা, ১৮৮০
২১. দীনবন্ধু রচনাবলী, পৃষ্ঠা-১৮৭
২২. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃষ্ঠা-৫৩
২৩. বিদ্যাদর্শন, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৭৬৪ সাল
২৪. ঐ
২৫. সংবাদ ভাস্কর, ২৭২ সংখ্যা, ১৮৪৪
২৬. ঐ
২৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩য় ভাগ, ২৬ সংখ্যা, ১ আশ্বিন, ১৭৬৭ শক।